আধুনিক

পৃথিবীর ইতিহাস








Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VIII of all Schools in West Bengal. Vide No Syll/H/VIII/81/61 dated 10. 12. 81.

আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক, এম. এ. (ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
বি. এড., পি-এইচ. ডি.
অধ্যক্ষ, শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজ, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া,
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নৈহাটী নন্দলাল ঘোষ বি. টি. কলেজ ও
সিমুরালী ভাগীরথী কলেজ অব এডুকেশান।

●

শ্রীহেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. টি., সাহিত্য বিনোদ,
সাহিত্য পুরাণরত্ন,
ইতিহাসের শিক্ষক, দুবরাজপুর শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠ, বীরভূম।

মণ্ডল ব্রাদার্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১নং বিধান সরণী · কলিকাতা-৭০০০৭৩

॥ প্রকাশক ॥
এম. মণ্ডল
১, বিধান সরণী,
কলি-৭০০০৭৩

সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৭
[খোলা বাজার থেকে কেনা কাগজে মুদ্রিত]

মূল্য ঃ সতেরো টাকা মাত্র
[মুদ্রিত মূল্যই সঠিক মূল্য]

॥ মুদ্রাকর ॥
দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

১। **পরিবর্তনশীল অর্থনীতিঃ** ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনঃ সামন্তপ্রথার অবক্ষয়—কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু উন্নয়ন—শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পশ্চাতে নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের অবদান—ইহার প্রভাব।

২। **ইউরোপের নবজাগরণঃ** [অত্যন্ত সহজ ও সরল উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়] (ক) ইহার স্বরূপঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রবহমান এক বিবর্তনের ধারা কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের দ্বারা (১৪৫৩) উদ্দীপিত—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন—বৈজ্ঞানিক সত্য ও যথার্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রাচীন গ্রীক জীবনচর্যার পুনঃ প্রতিষ্ঠা পরলোক-চিন্তা ও যাজকের মধ্যস্থতার প্রতি অনাস্থা—প্রথাগত কর্তৃত্বে অবিশ্বাস—প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে ঐশ্বরিক কোন অবদানকে অস্বীকার—যুক্তিবাদী মন লইয়া জীবন অনুসন্ধান—মানুষের গতানুগতিক সংস্কারকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের ব্যর্থ প্রয়াস—ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে এক যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ ও প্রসার। (খ) ইটালীর নেতৃত্ব-দানঃ শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সের ধনী বণিকদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তথা হইতে মিলান, রোম এবং অন্যান্য নগর রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার অতঃপর আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া জার্মানী, ফ্ল্যাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে উহার অনুপ্রবেশ।

(I) **চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণঃ** পরিশীলিত মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের বিকাশঃ সেই পরিপ্রেক্ষিতে দান্তে, পেত্রার্ক, মেকিয়াভেলি, বোকাচ্চিও, স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন, চসার, স্পেন্সার, সেক্‌স্‌পীয়ার, ইরাসমাস্, সারভান্তিস ও রাকায়েলের অবদান। (জীবন-বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রয়োজন নাই। জীবন এবং প্রকৃতি যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসা জাগরণে তাঁহাদের অবদান উল্লেখ করিলেই চলিবে।) (II) **শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণঃ** (অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল, এঞ্জেলো।

(III) **বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণঃ** রোজার বেকন, স্যার ফ্রান্সিস, বেকন, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, কোপারনিকাস্, গ্যালিলিও, গুটেনবার্গ (মুদ্রাযন্ত্র)।

৩। **ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তারঃ** পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইটালীর নবজাগরণের মূলভাব পোর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকদের উন্নতমানের বিভিন্ন যন্ত্রের (দিক্‌নির্ণয় ও উচ্চতামাপক যন্ত্র) সাহায্যে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করিল প্রিন্স হেনরী, বারথেলোমিউ ডিয়াজ, আলবুকার্ক, ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, কলম্বাস, বালবোয়া, আমেরিগো, ভেসপুচি, ম্যাগেলান।

ফলশ্রুতিঃ (ক) মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি নব আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত। (খ) জলপথে ভূপ্রদক্ষিণ (গ) বাণিজ্যের

প্রসার—উপনিবেশ স্থাপন—ঔপনিবেশিক শোষণ—স্পেনীয় নাবিকদের রাজ্যজয় (ঘ) জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান।

৪। ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন: (ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই প্রসঙ্গে জন ওয়াই ক্লীফ, জন হাস্ ও মার্টিন লুথারের বাণী ও কর্মপদ্ধতি (গল্পচ্ছলে)। (খ) ফলাফল—জার্মানির কয়েকটি রাজ্য লুথেরান অথবা প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা—উত্তর ইউরোপ, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদের প্রসার (গ) ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার: (১) আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতির প্রয়োজন—যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন—দমনমূলক নীতি প্রয়োগ এবং যাজকদের বিচার-সভায় (Inquisition court) বিচারের দ্বারা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতবাদের উচ্ছেদ-সাধন—জেস্যুইট সোসাইটি—কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট (১৫৪৪-১৫৬৩)। (ক্যাথলিক চার্চের অন্ধ বিশ্বাসের বিবরণ উপেক্ষা করিয়া কেবল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই চলিবে) । পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্যসমবায় বনাম সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ (১৫৪৬-১৫৫৫)—অগ্‌সবার্গের সন্ধি ১৫৫৫। বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই। কেবল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই চলিবে। (ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা—তাঁহার অপশাসন ও প্রজাদের উপর অত্যধিক করস্থাপনের ফলে উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ—উহার ফলাফল—১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং ডাচ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডে (অষ্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ডে) বেলজিয়াম নামে পরিচিত হইল (ক্যাথলিক রাজ্য)। (ঘ) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য ফিলিপের প্রয়াস। (সংক্ষিপ্তাকারে) স্প্যানিস আর্মাডা—ফিলিপের ব্যর্থতা।

৫। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব: রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ—গৃহযুদ্ধ (সংক্ষেপে)—ক্রমওয়েল এবং কমনওয়েলথ—স্টুয়র্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব—বিল অব্ রাইট্স্ (১৬৮৯) এবং অন্যান্য ফলাফল।

ভারতবর্ষ: (ক) মুঘল সাম্রাজ্য—প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭)—মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন—কয়েকজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নামোল্লেখ—সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-১৭৫৭) (সংক্ষিপ্তাকারে।)

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন: (i) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সংক্ষিপ্তাকারে) (ii) মারাঠা শক্তির উত্থান বিস্তার **(যুদ্ধের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই—গল্পচ্ছলে লিখিত হইবে।)** (iii) শিখ জাতির উত্থান ও তাহার সংগঠন (সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে)।

৭। **ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার**ঃ (১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সবটাই সংক্ষেপে) (ক) প্রথম স্তর—১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (খ) পরবর্তী স্তর—১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (গ) সিপাহী বিদ্রোহ—কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ (ঘ) ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষ।

৮। **অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ**ঃ যুক্তিবাদের যুগ (জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। (ক) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ—কারণ—আমেরিকার সাফল্যের কারণ—ফলাফল। (খ) ইংলণ্ডের শিল্প-বিল্পব—ইহার অর্থ—কৃষি বিপ্লব—আবিষ্কার—ফলাফল। (গ) ফরাসী বিপ্লব: (i) প্রাক্-বিপ্লব চিন্তাধারা কয়েকজন বিখ্যাত নেতা—রূশো, ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু—বিপ্লবের কারণ ও প্রসার (সংক্ষিপ্তাকারে)। (ii) বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন—ইউরোপের বিদ্রোহ। (iii) ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল।

৯। **১৮১৫ সাল হইতে ইউরোপের ইতিহাস**ঃ (ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যাহা ন্যায্য অধিকার নীতির সমর্থনে চতুঃশক্তি মিতালি ও মেটারনিকের কার্যাবলীর মধ্য দিয়া প্রতিভাত (সংক্ষিপ্তাকারে)। (খ) ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ (সংক্ষেপে। (গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ—মূল কারণসমূহ—আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা। (ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন (যন্ত্র সভ্যতা)—ইহার ফলাফল শ্রমিক শ্রেণী—মার্কস ও এঙ্গেলস্।

১০। **১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ**ঃ (সাধারণভাবে চীন ও জাপানের কথা সহজ করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে। যুদ্ধ ও সন্ধির বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই)। (১) অহিফেন যুদ্ধ, নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২) এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি—টিয়েন সিনের সন্ধি; বন্দরচুক্তি—বিদেশীদের বসতি ও তাহাদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ—চীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অংশ বিশেষ অধিকারের জন্য বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—হের উন্মুক্তদ্বার নীতি (১৯০১)।

(২) চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩)—শতদিনের সংস্কার (১৮৯৮)—বক্সার বিদ্রোহ—ডাওয়েজার সাম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া—আভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১৯০২-১৯০৮)—শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১)—প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২) সান-ইয়াৎ-সেন ও ইউ-য়ান-সিকাই। (সবটাই সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে)।

(খ) বৃহৎ শক্তি হিসাবে জাপানের অভ্যুদয় (১৯১৪ সাল পর্যন্ত) মেইজি যুদ্ধে সম্রাটের শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)—সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পাশ্চাত্তীকরণ—চীন-জাপান যুদ্ধের পথে (১৮৯৪-১৮৯৫) জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা—১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানী শক্তি প্রতিষ্ঠার

প্রধান সহায়)—রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫)—কোরিয়া দখল (১৯১০)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্বল চীনের উপর জাপানের ২১ দফা দাবি। (কয়েকটি মূল দাবির উল্লেখ করিলেই চলিবে, সবটাই সংক্ষেপে ও গল্পচ্ছলে)।

১১। **বৃটিশ অধীনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮-১৯১৪) ঃ** নূতন শাসন-ব্যবস্থা—সাম্রাজ্যবিস্তার উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কার—জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ—ভারতের জাতীয়কংগ্রেস—চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৪-১৯১৪)।

১২। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ** কারণ এবং উহার ব্যাপকতা—ফলাফল।

১৩। **রুশ বিপ্লব ঃ** কারণ—ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের উপর উহার প্রতিক্রিয়া।

১৪। **ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ঃ** প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন এবং ইউরোপের পুনর্গঠন—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব—জাতি-সংঘ উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা। (সংক্ষেপে)।

১৫। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ** কারণ ও ফলাফল।

১৬। **ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭) ঃ** স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর—অসহযোগ আন্দোলন—কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণ—আইন অমান্য আন্দোলন —'ভারত ছাড়' আজাদ হিন্দ্ ও গণমনে উহার প্রতিক্রিয়া—ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতালাভ।

১৭। **চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯) ঃ** (ক) ইউ-য়ান-সিকাই ও সান ইয়াৎ সেনের অন্তর্কলহে প্রজাতন্ত্রে ভাঙ্গন—১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ইউ-য়ানের মৃত্যু তু-চুনদের (যোদ্ধাগোষ্ঠী) কবলে চীন—সান্-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন্ তাঙ্ (জাতীয়তাবাদী দল) তাঁহার তিনটি মৌলিক নীতি—৪ঠা মের আন্দোলন—১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু—কুয়োমিন্ তাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (১৯২১-১৯২৪) ; চিয়াং কাইশেকের দমনমূলক নীতি—উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টদের ৬০০০ মাইল দীর্ঘ অভিযান—১৯৩৭ সালের সিয়াং-ফু ঘটনা—১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ হইতে চীনের উপর জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐক্যমত গঠনের প্রচেষ্টা—চীনের উপর জাপানী আক্রমণ ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মিলিত। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কুয়োমিন্ তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা—চিয়াং ও তাঁহার কুয়োমিন্ তাঙ্ দল চীন হইতে ফরমোজায় (তাই-ওয়ান) বহিষ্কৃত—১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মাওয়ের নেতৃত্বাধীন চীনের ভূখণ্ডের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

(খ) ১৯৪৫ সালের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব—ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া।

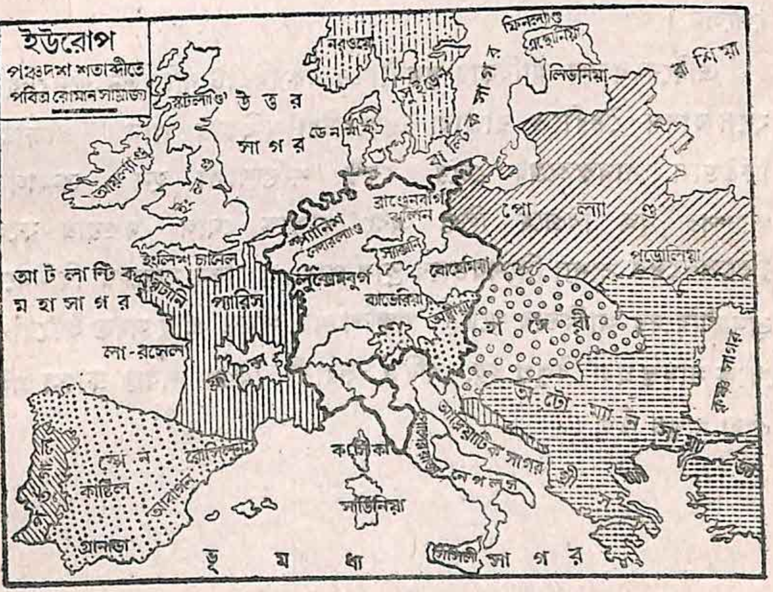
(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার—আতলান্তিক সনদ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা—ইহার উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য—সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার।

১ | পরিবর্তনশীল অর্থনীতি

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

আধুনিক যুগের সূত্রপাত ও সামন্তপ্রথার অবক্ষয়

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীতে এক উন্নত কৃষ্টির বিকাশ প্রাচীন পৃথিবীকে সমসাময়িক পৃথিবী থেকে পৃথক করেছিল। পরবর্তীকালে এই কৃষ্টির ভাবধারাগুলি থেকে 'রেনেসাঁসের' উদ্ভব। 'রেনেসাঁস' কথাটির অর্থ নবজাগরণ। রেনেসাঁসের যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে নানা ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা যায়। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনেতার আবির্ভাব ঘটে। পশ্চিম সমাজের ইতিহাসে রেনেসাঁস এক যুগান্তকারী ঘটনা। অনেকের মতে তুরস্ক



কর্তৃক ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রেনেসাঁসের সূচনা হয়। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

খ্রীস্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্ত-প্রথার চরম বিকাশলাভ ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বুকে নেমে আসে মহামারীর করাল ছায়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে চরম অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে এই মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সামন্তপ্রথা জনসমর্থনলাভে ব্যর্থ হয়। সামন্ত-প্রভু ও অভিজাতরা এই প্রথার সুযোগে জনগনকে বঞ্চিত করে লাভবান হওয়ার ফলে জনগণ ও অভিজাতদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এই ব্যবস্থায় রাজারা নিছক ক্রীড়নকে পরিণত হন। ফলে তাঁরা এই ব্যবস্থা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হন। ধর্মযুদ্ধে বহু সামন্তপ্রভু নিহত হন। যাঁরা জীবিত রইলেন তাঁরা ভগ্নস্বাস্থ্য ও আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে এলেন। সামন্তপ্রভুরা জমিদারী বন্ধক রেখে বা বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এর ফলে রাজারা ও ধনী ব্যবসায়ীরা এইসব জমিদারীগুলি দখল করার সুযোগ পেলেন।

এদিকে বারুদ আবিষ্কার যুদ্ধনীতির এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ফলে বারুদ তৈরীতে রাজারা একচেটিয়া অধিকার পান। রাজারা ফিউডাল সামন্ততন্ত্রের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হন। ক্রমাগত পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত এবং ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে ভিলেনদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং দিন মজুরের বিনিময়ে শ্রমজীবিদের আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত ইউরোপ থেকে সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হয়, যদিও ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ফ্রান্সে এই প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এবং তার প্রভাব

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। খোলা জমিতে প্রাচীর বেষ্ঠন, জলা জমি থেকে জল নিষ্কাষণ, গবাদি পশুর খাদ্যশস্য উৎপাদন, অনুর্বর ও পতিত জমিতে শালগমের চাষ, নীচু জমিতে মেষ-চারণের ব্যবস্থা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভূত উন্নতিলাভ করেছিল। এই সময় ইউরোপে লাঙ্গলে লোহার ফাল ও কাস্তে প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। স্পেনে উৎকৃষ্ট সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, আফ্রিকা থেকে নতুন জলপাই গাছ আমদানী এবং পুরানো চাষের সঙ্গে সঙ্গে আখ, তুঁত, তুলা, জাফরণ প্রভৃতির চাষও শুরু হয়। স্পেনের ব্যাপক অঞ্চলে বেদানা, কমলালেবু ও ডুমুরের চাষ এবং দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলীতেও কমলালেবু ও ডুমুরের চাষ ঐ সময় শুরু হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীতে ধানের চাষ হতে থাকে। তুঁত, জাফরাণ ও তুলা চাষ বস্ত্রশিল্পের এবং আঙ্গুর ও আখের চাষ মদ্যশিল্প বিকাশে সাহায্য করেছিল।

বায়ুচালিত হাপর-চুল্লীর ব্যবহারে এই সময় ইউরোপে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতে থাকে। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধগুলির জন্য জাহাজের চাহিদা থাকায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠে।

কৃষির বিস্তার, শিল্পের বিকাশ, নানা খনিজ দ্রব্যের সন্ধানলাভ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এইসব কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসারলাভ ঘটে এবং ছোট-বড় বহু শহরের পত্তন হয়। নতুন নতুন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে টাকা-পয়সা লেন-দেনের জন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. প্রথম রেনেসাঁসের স্থচনা হয় কোন দেশে ?

২. কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতন কত খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল ?

৩. ইটালীতে কোন্ সময় থেকে ধানের চাষ হতে থাকে ?

৪. ইংলণ্ড কোন্ শতাব্দীতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে ?

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে কোন্ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১. কোন্ কোন্ শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্ত প্রথা বিকাশলাভ করেছিল ?

২. কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে ইংলণ্ড কৃষিতে উন্নতি লাভ করেছিল ?

৩. ইটালীতে রেনেসাঁসের স্থচনা হয় কেন এবং কোন সময়ে ?

৪. ইটালীতে কি কি শিল্প উন্নতিলাভ করেছিল ?

৫. রেনেসাঁসের প্রভাবে কৃষি ও শিল্পের কি উন্নতি হয়েছিল ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি কিভাবে ঘটে এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান কিভাবে হয় ?

২. আধুনিক যুগের স্ত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ? এর ফলাফল বর্ণনা কর ?

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. রেনেসাঁস কথাটির অর্থ — ।

২. পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত ইউরোপ থেকে — বিলুপ্ত হল।

৩. বায়ুচালিত হাপর-চুল্লীর ব্যবহারে এই সময়ে ইউরোপে—ব্যবহার হতে থাকে।

৪. — জন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

খ. যেটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

১. ইউরোপে আধুনিক যুগের স্থচনা হয়—১৩৪১/১৫১৪/১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে।

২. ইংলণ্ড কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল—পঞ্চদশ/ষোড়শ/ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

———

২ | ইউরোপের নবজাগরণ

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

রেনেসাঁসের স্বরূপ

রেনেসাঁস কথাটির অর্থ নবজন্ম। নবজাগরণের সূত্রপাত ইটালীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর লোকেরা রোম ও গ্রীসের সাহিত্য ও শিল্পকলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা নতুনভাবে শুরু করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আলোচনা ও অনুশীলনকেই রেনেসাঁস বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবজন্ম বলা হয়।

অনেকে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের সময় থেকে রেনেসাঁসের সূচনা গণনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁসের সূচনা এর অনেক আগে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে স্পেনের অনুকরণে পশ্চিম ইউরোপে প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। ফলে বিদ্যাচর্চ্চার আগ্রহ প্রবল হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে এক নতুন নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। অনেকটা এই কারণেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতন হলে বহু গ্রীক পণ্ডিত তাঁদের অমূল্য পুঁথিসমূহসহ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলেন পশ্চিম ইউরোপের ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে। সব দেশই এই পণ্ডিতদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। নবাগত পণ্ডিতদের নেতৃত্বে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলনের ফলে একদিকে যেমন মানুষের মন সেই প্রাচীন জাতি দু'টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, অন্যদিকে তারা মধ্যযুগীয় সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মানুষের মধ্যযুগীয় জড় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেল এবং পূর্বের ন্যায় আবার স্বাধীন চিন্তাধারা, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব,

সৌন্দর্যপ্রীতি এবং বাঁচবার ও জীবন উপভোগ করার আনন্দ তাদের মধ্যে জেগে উঠে। জীবনের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে চার্চের কঠোর নির্দেশ তারা মানতে চাইল না। মধ্যযুগের কু-সংস্কার ঝেড়ে ফেলে গ্রীক ও রোমানদের মত সুন্দর জীবন যাপনের জন্য তারা ব্যাগ্র হয়ে উঠল। একেই 'রেনেসাঁস' বলা হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ইটালীর নেতৃত্বদান

চতুর্দশ শতকে ইটালীর বিখ্যাত কবি ও সুপণ্ডিত 'পেত্রার্ক' ল্যাটিন সাহিত্য ও শিল্পের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করান। প্রাচীন রোম ও পরে গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতি ইটালীবাসীরা এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে, মধ্যযুগের সব কিছুই তাদের কাছে বর্বরোচিত মনে হত। এইভাবে কনস্ট্যান্টি-নোপ্‌লের পর ইটালীতেই প্রথম রেনেসাঁসের সূচনা।

ইটালীর ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস ও রোমনগরী বিশেষ সমৃদ্ধ-শালী ছিল। এইসব শহরে পূর্বের গৌরব-স্মৃতি তখনও বিদ্যমান। প্রাচ্যের সঙ্গে এই শহরগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসারলাভ ঘটে। ধর্মযুদ্ধের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এই শহরগুলির অধিবাসীরা প্রচুর অর্থশালী হয়ে উঠে। ধনী বণিকগণ রেনেসাঁস আন্দোলনের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা সুন্দরের পূজারী ছিলেন ; সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রাসাদ ও শিল্পকার্য পছন্দ করতেন এবং সেইসব শিল্পকার্যের জন্য শিল্পীকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিতেন। কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের পর যেসব গ্রীক পণ্ডিত ইউরোপে এসেছিলেন তাঁরাও যথেষ্ট সমাদর পান। এইসব শিল্পী ও পণ্ডিতদের আগমনে ইটালীর শহরগুলি সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

এইভাবে রেনেসাঁসের প্রভাব ইংলণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য-

ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের প্রভাব আমরা স্যার টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে দেখতে পাই। ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থটি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অন্যতম। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইংলণ্ডে প্রথম অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং বহু ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইংলণ্ডে সৃষ্টি হয় শেক্স্পীয়ারের মহান সাহিত্য। তাঁর রচিত 'হ্যামলেট,' 'কিংলীয়ার,' 'ম্যাক্‌বেথ' প্রভৃতি নাটক আজও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। এ যুগের ইংলণ্ডের আর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন 'বেকন'। তিনিই ইংরেজী দর্শনের আদিগুরু।

রেনেসাঁসের ফলে ইটালীর লোকেরা বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতিতে অনুরাগী হয়ে উঠে কিন্তু এর প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপে ফল হয় অন্যরূপ। গ্রীক ও হিব্রু ভাষাচর্চার ফলে তারা বাইবেলের যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং রোমান ক্যাথলিকদের দুর্নীতিগুলি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে ধর্মসংস্কার নামে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

জার্মানিতে 'মার্টিন লুথার' নামক একজন দেশীয় খ্রীস্টান সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম রেনেসাঁস প্রভাব-প্রসূত স্বাধীন চিন্তাধারায় ধর্মকে নিষ্কলুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে জার্মানিতে চিত্রশিল্পের প্রসারলাভ ঘটে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর চিত্রকলার প্রভাব জার্মানিতে পরিলক্ষিত হয়।

এই সময় হল্যাণ্ডে বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও শিল্পীদের আবির্ভাব হয়। শিল্পী 'রেঁমব্রাণ্ট' ডাচ চিত্রকরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পোল্যাণ্ডও রেনেসাঁসের প্রভাবে পড়েছিল। চারুশিল্প ও সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও প্রসারলাভ ঘটেছিল। পোল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক 'কোপারনিকাস্' প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল নয়, সে নিজেই সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। তাঁর এই মহাসত্যটিকে পরবর্তীকালে ইটালীর বৈজ্ঞানিক 'গ্যালিলিও' দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেন।

রেনেসাঁসের প্রভাবে যে সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকাশ আমরা পোর্তুগাল ও স্পেনে দেখি। ফরাসী দেশে রেনেসাঁস প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যানুরাগের সৃষ্টি করে। ফরাসী চারণকবিরা বহুদিন ধরে চারণ-গীতি আরম্ভ করেছিলেন। রেনেসাঁসের প্রভাবে ফরাসী দেশেও প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্য প্রভাবান্বিত কবিতা, নাটক ও গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হতে থাকে। রেনেসাঁসের প্রভাব ফরাসী ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে দেখা যায়। ইটালীতে যেসব শিল্পী তখন খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'রাফায়েল,' 'মাইকেল এঞ্জেলো' ও লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইটালীর এই তিনজন শিল্পীই রোম এবং ফ্লোরেন্সের বহু গীর্জা ও প্রাসাদে নিজেদের তুলির রেখায় চিত্র এঁকে নিজেদের অমর করে রেখে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁসের আহ্বানে ইটালীর সীমা অতিক্রম করে আল্পস্ পর্বতের উত্তরে জার্মানি, ফ্লাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পৌঁছলে এই দেশগুলি থেকে দলে দলে বিদ্যার্থীরা ইটালীতে আসতে লাগলেন। বিদ্যার্থীরা রেনেসাঁসের সত্যিকার অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যান। তখন ঐ দেশগুলিতে রেনেসাঁসের প্রকৃত প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●
চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ

মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান ছিল তাঁরা হিউম্যানিস্ট নামে পরিচিত ছিলেন। হিউম্যানিস্ট কথাটির অর্থ হল মানবতাবাদী। কথাটি এসেছে ল্যাটিন 'Homo' শব্দ থেকে, যার অর্থ মানবতাবাদী। মানুষ ও মানুষের আবাসস্থল এই পৃথিবী হিউম্যানিস্টদের রচনা ও আলোচনার প্রধান বিষয়। মানবজাতির জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার জন্য হিউম্যানিস্টরা আজীবন চেষ্টা করেছেন। এই মনীষীদের জীবনের ব্রত ছিল মানুষকে মানুষের প্রকৃত

মর্যাদায় স্থাপন করা। মধ্যযুগের শিক্ষা ছিল ধর্মসাপেক্ষ ; মানুষের জ্ঞান বা শিক্ষা ধর্মীয় বিষয়গুলিতেই ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ। এই দুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু 'মানুষ'। হিউম্যানিস্টরা ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুবাদ করতেন এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করতেন। হিউম্যানিস্টরা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে মানবজাতির কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করতেন।

অপরপক্ষে ইউরোপে যাঁরা রেনেসাঁসের প্রবর্তন করেন তাঁদের বলা হয় হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী। এইরকম একজন মানবতাবাদী ছিলেন পেত্রার্ক। তিনিই সর্বপ্রথম ইটালীতে রেনেসাঁসের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। অল্প বয়সে ল্যাটিন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, পশ্চিম ইউরোপের বহু ধর্মমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে গভীর যত্নের সঙ্গে পাঠ করেন এবং দেশবাসীর কাছে তার ভাব ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন। বহু ল্যাটিন রচনা তাঁর চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন রোমান লেখকদের অনুকরণে তিনি অনেক কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেন। পেত্রার্ক ইটালিয়ানদের মনে গ্রীক ও রোমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর উৎসাহ জাগিয়েছিলেন। রোমনগরীতে তাঁকে কবির প্রাপ্য সর্বোচ্চ সম্মান 'রাজকবি' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।



পেত্রার্ক

পেত্রার্কের সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে হয় তাঁর ছাত্র ও বন্ধু বোকাচ্চিওর। তাঁর রচিত ইটালী গল্পগুচ্ছ 'ডে কা মে র ণ'

শেক্‌স্‌পীয়ারের মত কবিকেও প্রেরণা দিয়েছিল। 'ডেকামেরন' বোকাচ্চিওর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মানবজীবনের প্রেম ভালবাসার প্রভাব বর্ণনাই হ'ল গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য। বোকাচ্চিও দেশবাসীর কাছে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরব প্রচার করেন। তাঁর শিক্ষাদানের ফলে ইটালীর লোকেরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পুনঃসৃষ্টির কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন।



বোকাচ্চিও

ইটালীর হিউম্যানিস্টদের মধ্যে দান্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ডিভাইন কমেডি' গ্রন্থ ইটালীর কথ্য ভাষায় পুস্তক রচনার পথ প্রদর্শন করেছিল।

ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনায় নতুন যুগের উপযোগী চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন মেকিয়াভেলি। তিনি থাকতেন ইটালীতে। আমাদের দেশের কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' মত একখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই লিখে ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বইটির নাম 'দি প্রিন্স্'। এই গ্রন্থে বহু-বিভক্ত ইটালীতে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। তিনি বইটিতে রাজনীতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। দেশের মঙ্গলের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-সম্পন্ন শাসক ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে



মেকিয়াভেলি

পারেন—এই মতবাদ মেকিয়াভেলি প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন রাজার লক্ষ্য শক্তিলাভ, অর্থলাভ ও সম্মানলাভ। রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মের কোন স্থান নেই।


স্যার ফ্রান্সিস বেকন্

রেনেসাঁস আন্দোলন ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছালে সেই সময় ইংলণ্ডে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ইংলণ্ডের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন্। চমৎকার ভাষায় লেখা তাঁর চিন্তাশীল রচনাবলী গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। তিনি একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও ছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সাহিত্যচর্চ্চার আগ্রহ দেখা দেয়। এই সাহিত্যানুরাগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল চসারের 'ক্যান্টারবেরী-টেলস্'। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইংলণ্ডে প্রথম অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভব হয়, ঐ সময় বহু গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুদিত হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের স্থায়ীত্বকাল অল্পদিন। এর পরেই আসে স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন'-এর মতন সুন্দর ইংরেজী সাহিত্য।


শেক্‌স্‌পীয়ার

ইংরেজ মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হ'ল নাট্য সাহিত্য। এই সময়ের

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়ার। তাঁর রচিত 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'কিংলীয়ার', 'জুলিয়াস সীজার' 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলি আজও বিশ্বসাহিত্যে অমর সম্পদ। রেনেসাঁসের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হলেও শেক্‌স্‌পীয়ার প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য অনুকরণ করেন নি। তাই এলিজাবেথের সময়কার নাট্য-সাহিত্য এক নতুন, স্বাধীন, সাহসী এবং স্বাভাবিক সাহিত্যচেতনার প্রতীক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট্ ছিলেন ইরাসমাস্। ইটালীর হিউম্যানিস্টদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষকদের প্রভাবে এসে ইরাসমাস হল্যাণ্ডে স্বাধীন চিন্তাধারার মাধ্যমে ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দেশীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে দেখা দিলেও হল্যাণ্ডে তা সম্ভব হয় নি। ইরাসমাস্ লিখেছিলেন ল্যাটিন ভাষায়।


ইরাসমাস্

স্পেনে রেনেসাঁসের প্রভাবে সারভান্তিস্ রচিত 'ডন্ কুইকজোট্' গ্রন্থখানি পৃথিবীর সাহিত্য জগতের অমূল্য সম্পদ।

ফরাসী ইউম্যানিস্টদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রাবেলা। প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন ; পরে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ও রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

ইটালীতে রেনেসাঁসের চরম বিকাশ আমরা দেখতে পাই এখানকার চিত্রাঙ্কন বিদ্যায়, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে। এই সকল ক্ষেত্রে যেসব শিল্পী তখন খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্দো-দা ভিঞ্চির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীক ও রোমান স্থাপত্য-শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। রেনেসাঁস যুগের শিল্পীরা নিজেদের এই সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তাঁদের শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তু ছিল মানবদেহের সৌন্দর্য, ভাবের গভীরতা, প্রকৃতির রূপ ইত্যাদি পরিস্ফুট করা।



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির মত বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। শিল্প ও বিজ্ঞান এই দু'টি বিষয়েই তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রগুলির মধ্যে 'ম্যাডোনা অব্ দি রক্স', 'দি লাস্ট সাপার', 'মোনালিসা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবি আঁকা ছাড়া নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবনেও তাঁর খুব মেধা ছিল। এমনকি উড়োজাহাজের পরিকল্পনা নিয়েও তিনি নাকি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

আর একজন ইটালীর শিল্পী ছিলেন রাফায়েল (১৪৮৩—১৫২০ খ্রীঃ)। ছবি এঁকে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি

মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু এরই মধ্যে ছবি এঁকে অমর হয়ে আছেন। তাঁর সব চিত্রে এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাব দেখা যায়। তাঁর



রাফায়েল



রাফায়েল অঙ্কিত ম্যাডোনা

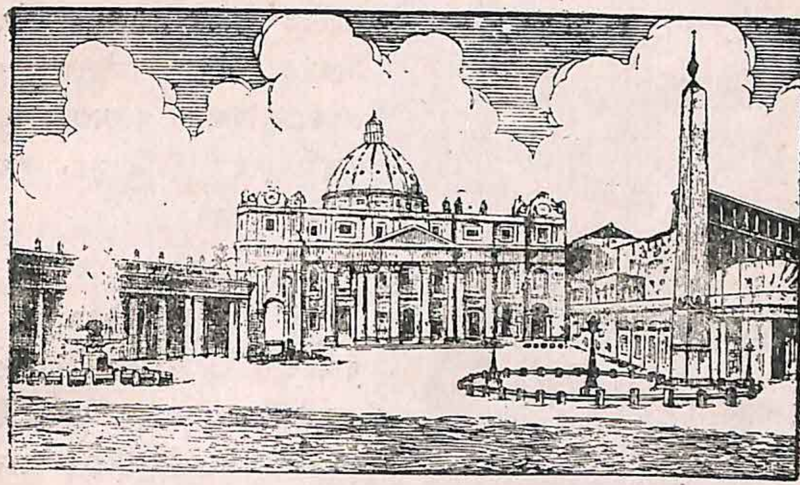
বিখ্যাত ছবি 'ম্যাডোনা'-তে শিশু যীশু ও তাঁর মাতার যে কোমল ও পবিত্র সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। তাঁর শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় রোমে পোপের ভ্যাটিকান প্রাসাদে।



মাইকেল এঞ্জেলো

লিওনার্দোর মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ফ্লোরেন্সের আর একজন শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রীঃ)। মাইকেল ছিলেন উদার ও স্বাধীনচেতা। ছবি আঁকা, পাথরের মূর্তি গড়তে ও ঘর-বাড়ীর পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রোমের 'সেন্টপিটার্স গির্জা' এই যুগের স্থাপত্য শিল্পর

এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে এই বিখ্যাত গীর্জাটি তৈরী করা হয়েছিল। মাইকেল এঞ্জেলো



রোমের সেন্টপিটার্স গির্জা

এর উপরকার বৃহৎ গম্বুজটি নির্মাণ করেছিলেন। রোমের গির্জায় তাঁর আঁকা শেষবিচার ছবি জগদ্বিখ্যাত। ভাস্কর্যে তাঁর নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে ফ্লোরেন্সের 'ডেভিডের মূর্তি'। তাছাড়া মাইকেল এঞ্জেলো একজন বড় কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও ছিলেন।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন পুনরুদ্ধারের ফলে রেনেসাঁসের যুগে অনুসন্ধিৎসা এবং চিন্তার স্বাধীনতা আবার জেগে উঠে এবং ইউরোপে বিজ্ঞানের নব বিকাশের সূচনা হয়। বারুদ আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। বারুদ আবিষ্কার করেছিলেন রোজার বেকন (১২১৪—১২৯৩ খ্রীঃ) নামে একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলিও জানতেন। বর্তমান যুগে তাঁর আবিষ্কারগুলির মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি বায়ুপাম্প আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১—১৬২৬ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বেকন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। এইভাবে বিজ্ঞানে গবেষণা করার পদ্ধতি বিষয়ে তিনি নূতন পথ দেখিয়েছিলেন।



কোপারনিকাস

পোল্যাণ্ডের যাজক কোপারনিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩ খ্রীঃ) ধর্মচিন্তার চেয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অধিক অনুরাগী ছিলেন। টলেমী নামক মিশরের গ্রীক পণ্ডিত প্রচার করেছিলেন যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং সূর্য ও তারাগুলি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোপারনিকাস প্রথম প্রমাণ করলেন যে সূর্যই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের কেন্দ্র ; পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু চার্চের হাতে শাস্তির ভয়ে তিনি একথা প্রকাশ করতে সাহস পান নি। কোপারনিকাসের মৃত্যুর পর দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই মহাসত্যটিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৫২ খ্রীঃ)। তাঁর এই মতবাদকে চার্চের যাজকরা সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি।



গ্যালিলিও

রেনেসাঁসের যুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হ'ল

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। জার্মানির গুটেনবার্গ নামে এক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি কাঠের ফলকে বর্ণমালা খোদাই করে এগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে বই ছাপানোর এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে ল্যাটিন ভাষায় তিনি একখানি বাইবেল মুদ্রিত করেন। কয়েক বছর পর ক্যাক্সটন ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করায় বই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং দাম কমে গেল। ফলে দেশের লোকেরা জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবে মানবতাবাদীদের আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।



প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি ?

২. লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি কিসের জন্য বিখ্যাত ?

৩. মাইকেল এঞ্জেলো কোন দেশের লোক ছিলেন ?

৪. গ্যালিলিও কোন যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে ?

৫. মেকিয়াভেলির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম কি ?

৬. ডেকামেরন কার লেখা ?

৭. পোল্যাণ্ডের কে জোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ?
৮. ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে ছিলেন ?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ**

১. কিভাবে ইটালীতে রেনেসাঁসের প্রথম বিকাশ ঘটে ?
২. স্যার ফ্রান্সিস বেকন কে ছিলেন ? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন ?
৩. রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলোর কি অবদান আমরা দেখতে পাই ?
৪. ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের কি প্রভাব আমরা দেখতে পাই ?
৫. ইটালীর শহরগুলি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় কেন ?

● **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১. রেনেসাঁস বলতে কি বোঝায় ? সাধারণ মানুষের জীবনে রেনেসাঁসের কি প্রভাব দেখা দিয়েছিল ?
২. শিল্পক্ষেত্রে রেনেসাঁসের কি প্রভাব দেখা যায় ?
৩. রেনেসাঁসের প্রভাবে বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছিল ?
৪. হিউম্যানিস্ট কাদের বলা হত ? হিউম্যানিস্টরা সাধারণ মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছিলেন ?
৫. হিউম্যানিস্টদের প্রভাবে ইংলণ্ডের সাহিত্য ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ?

● **নৈর্ব্যক্তির প্রশ্ন ঃ**

ক. সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দাও ঃ

১. ডেকামেরণ গ্রন্থটি রচনা করেন—
শেক্সপীয়ার ☐ দান্তে ☐ বোকাচ্চিও ☐ চসার ☐

২. মোনালিসা চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন—
রাফায়েল ☐ মাইকেল এঞ্জেলো ☐ লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি।

খ. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

১. ইতিহাস ও রাজনীতির আলোচনায় নতুন যুগের উপযোগী চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন — ।
২. ফরাসী হিউম্যানিস্টদের মধ্যে প্রধান ছিলেন — ।

---

৩ | ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের কাছে বহির্জগতের দরজা বন্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের অনেক দেশই ছিল তাদের অজানা।

নবজন্ম ও ধর্মসংস্কারের যুগে ইউরোপের অধিবাসীদের মনে যে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল তা তাদের নতুন নতুন অভিযানের পথ প্রশস্ত করেছিল। ক্রমশঃ তারা বড় বড় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সারা পৃথিবীই আবিষ্কার করে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় ইউরোপীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপীয়রাও নতুন নতুন দেশ ও সভ্যতার সন্ধান পেল।

মধ্যযুগের শেষ দিকে অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক চীন এবং সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের ফলে ইউরোপীয়দের কৌতূহল ও বিস্ময় আরও বাড়িয়ে তোলে। তাঁদের মধ্যে মার্কো-পোলোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন। মার্কোপোলো প্রাচ্য সম্বন্ধে বহু গল্প লিখে গেছেন এবং এই গল্প পাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে। ভৌগোলিক জ্ঞানের এই সম্প্রসারণ নতুনতর ভৌগোলিক আবিষ্কারে সহায়তা করে।



দিক্‌দর্শন যন্ত্র

ইটালীর ভেনিস নগর-রাষ্ট্রটি বাণিজ্যে ও নৌ-বিদ্যায় ইটালীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ভেনিসের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইটালীর জেনোয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র নৌ-বিদ্যা ও নৌ-বলে ভেনিসকে অতিক্রম করার জন্য তৎপর হয়। এই যুগে ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীর নগররাষ্ট্র নৌ-বিদ্যায় এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে ইটালীর বাজারে মানচিত্র, মহাসমুদ্রের পথনির্দেশক ছক, দিক্‌দর্শন যন্ত্র ও উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র প্রভৃতির অভাব ছিল না।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ভৌগোলিক আবিষ্কারে পোর্তুগালের প্রচেষ্টা

স্পেন ও পোর্তুগাল ইউরোপে দেশ আবিষ্কারে অগ্রণী ছিল। পোর্তুগালের সামুদ্রিক অভিযানের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল **হেনরী** নামে এক রাজকুমার (১৩৯৪—১৪০৭ খ্রীঃ)। তাঁর উৎসাহে প্রতি বছর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অভিযান পাঠান হ'ত। তাঁর লক্ষ্য ছিল আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরে ভারতে যাবার পথ আবিষ্কার করা। ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে বারথেলোমিউ ডিয়াজ নামে এক পোর্তুগীজ নাবিক প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অন্তরীপে পৌছান। ভারতে পৌছবার পথ এতদিনে আবিষ্কার হয়েছে মনে করে পোর্তুগালের রাজা ঐ স্থানের নাম দেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ'। পর্তুগালের রাজবংশের এই কুমার **নাবিক হেনরী** নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি ইটালীর



রাজকুমার হেনরী

সুবিখ্যাত নাবিক ও ভৌগোলিকদের নিয়ে পোর্তুগালে একটি শিক্ষাগার গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে সুশিক্ষিত নাবিকদের আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করতে পাঠাতেন।



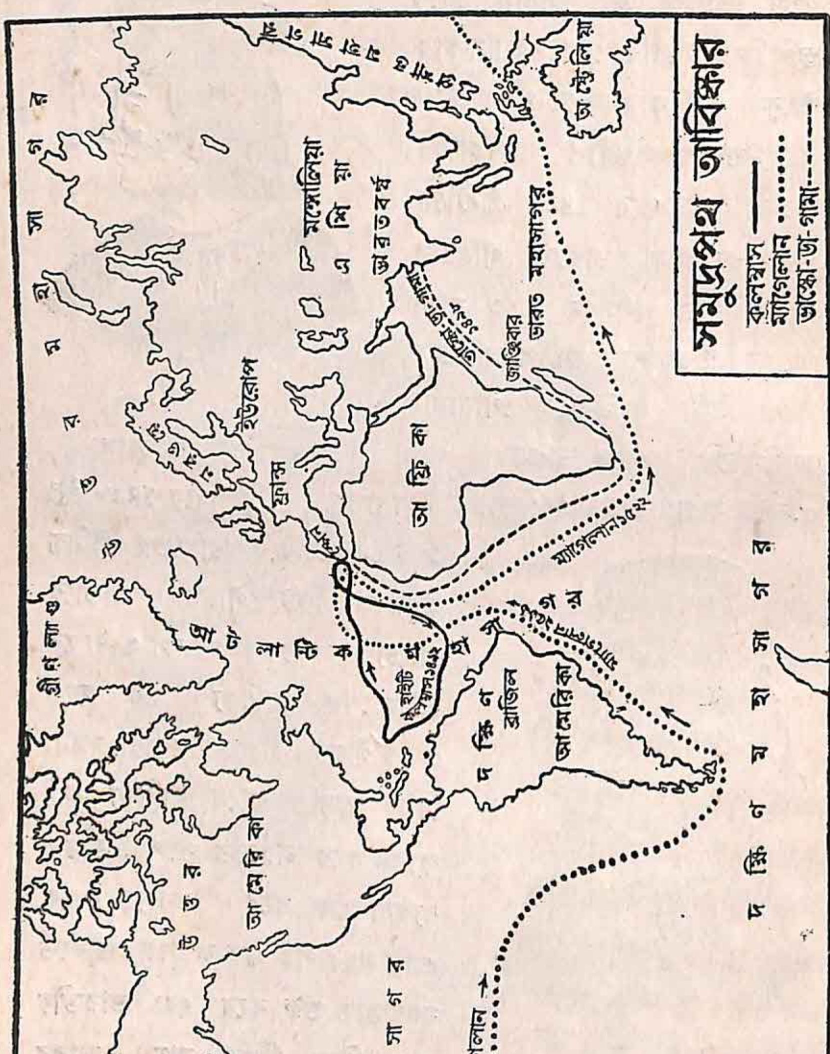
বারথেলোমিউ ডিয়াজ

উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে পৌঁছবার সংকল্প নিয়ে লিস্‌বন থেকে যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তিনি জাঞ্জিবারে পৌঁছান। জাঞ্জিবারে ভাস্কো-ডা-গামা পথ প্রদর্শক সংগ্রহ করেন এবং ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে ১৪৯৮ খ্রীঃ ১৭ই মে তারিখে ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর কালিকট পৌঁছান। এভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ইউরোপের বাণিজ্য শুরু হয়। পোর্তুগীজরা ভারতের গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ভারতের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা শুরু করে। এরপর থেকে প্রতি বছর পর্তুগীজ জাহাজ ভারতে যাতায়াত শুরু করে এবং ভারতীয় পণ্য নিয়ে ফিরে যায়। আরব বণিকেরা কিছুকাল পোর্তুগীজদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু নৌ-শক্তির সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যে আরব বণিকদের শক্তি উচ্ছেদ করে পোর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে। পোর্তুগীজ রাজসভার এক সভাসদ



ভাস্কো-ডা-গামা

কেব্রাল অভিজ্ঞ নাবিক বারথেলোমিউ ডিয়াজ সহ ১৩টি জাহাজ নিয়ে



পোর্তুগাল থেকে যাত্রা করে। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রাজিল আবিষ্কার করেন।

এরপর কেব্রাল ভারতের কালিকটে পৌঁছান। কেব্রালের ১৩টি জাহাজের মধ্যে মাত্র ৬টি জাহাজ লিস্‌বনে ফিরে আসে (১৫০১ খ্রীঃ)। আলবুকার্ক নামে এক প্রসিদ্ধ পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন এবং নিজ প্রতিভাবলে ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালের রাজ-প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হন। প্রাচ্যে পোর্তুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে আলবুকার্কের কাজই সর্বাগ্রগণ্য। কালক্রমে পোর্তুগীজরা ওরমুজ বন্দর দখল করার ফলে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত তাদের বাণিজ্য অধিকার বিস্তৃত হয় এবং চীন ও জাপানের সঙ্গে তারা বাণিজ্য শুরু করে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও তারা কয়েকটা ঘাঁটি অধিকার করে।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

ভৌগোলিক আবিষ্কারে স্পেনের প্রচেষ্টা

ভাস্কো-ডা-গামার সময়ে ইটালীর জেনোয়া শহরে কলম্বাস নামে একজন নাবিকের বাস ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী যখন গোলাকার তখন আটলান্টিক মহাসাগর ধরে বরাবর পশ্চিমদিকে গেলে ভারতবর্ষে পৌঁছানো যাবে এবং ভারতে পৌঁছানোই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভারতে আসার জন্য কলম্বাস পোর্তুগালের রাজার কাছে সাহায্য চাইলেন কিন্তু সফল হলেন না। তখন তিনি স্পেনে এসে রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলার কাছে তাঁর আবেদন জানান। ইসাবেলার আদেশে তিনখানি ছোট জাহাজ ও একশ' জন সঙ্গী দিয়ে কলম্বাসকে সাহায্য করা হ'ল। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কলম্বাস যাত্রা শুরু করে উনসত্তর দিন সমুদ্রযাত্রার পর স্থলে এসে পৌঁছালেন।



কলম্বাস

অর্থাৎ তিনি বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছান। এই দ্বীপপুঞ্জগুলিকে কলম্বাস ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে ভুল করেছিলেন। এই দ্বীপগুলি এখনও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত।

সেকালের অপর একজন বিখ্যাত নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি ছিলেন ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে এসে পৌঁছান। আমেরিকার আবিষ্কারক না হলেও তাঁরই নাম অনুসারে নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।



আমেরিগো ভেসপুচি

১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে বালবোয়া নামে এক স্পেন নাবিক বর্তমান পানামার ডারিয়েন নামক স্থান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর দেখতে পান এবং একটি ছোট জাহাজ তৈরী করে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হন। অবশ্য বালবোয়া চীন দেশে পৌঁছাতে পারেন নি।

ম্যাগেলান নামে আর একজন পোর্তুগীজ নাবিক স্পেনের অধীনে চাকরী নিয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে ভারতের দিকে এসেছিলেন। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করলেন। দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাগেলান প্রণালী (তাঁর নাম অনুসারে) অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়লেন। প্রশান্ত মহাসাগর নামটি তাঁরই দেওয়া। এই মহাসাগর দিয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম দিকে



ম্যাগেলান

অগ্রসর হয়ে তিনি এক দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের নামানুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হয় 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ'।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতি

সমুদ্র পথে নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয়রা এশিয়া, আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল এবং আমেরিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করে। ফলে এইসব দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি জানার আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা দেয়। পৃথিবী যে গোলাকৃতি এবং এশিয়া মহাদেশের পূর্ব প্রান্তে যে চীন, জাপান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল তা তাদের কাছে আর অজানা রইল না। এতকাল ভূমধ্যসাগর ছিল সভ্যতা, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল। এখন আটলান্টিক মহাসাগর তার স্থান অধিকার করে নিল। এই সময় থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

সমুদ্রপথে নতুন দেশের আবিষ্কার ও নতুন নতুন বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ইউরোপের দেশগুলির সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়।

স্বার্থপ্রণোদিত ব্যবসায়ীদের মনুষ্যত্বহীনতার ফলে ক্রীতদাস ব্যবসা উদ্ভূত হ'ল। মানুষকে পশুর চেয়ে নীচু স্তরের মনে করে আফ্রিকার উপকূল থেকে তাদের ধরে আমেরিকায় চালান দেওয়া হ'ত। ওলন্দাজ স্পেনবাসী ও পরে পোর্তুগীজরাও ক্রীতদাস ব্যবসা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।

ইউরোপের যে রাজ্য যে নতুন দেশ আবিষ্কার করল সেটিকে সে নিজের দখল বলে ঘোষণা করল। তার মধ্যে অগ্রণী ছিল পোর্তুগাল ও স্পেন। ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে পোপ তাদের এই দাবীর সমর্থনে

পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করেন। আটলান্টিকের মধ্যদিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটা সীমারেখা টেনে তার পূর্বদিকের সমস্ত এলাকা পোর্তুগালের এবং পশ্চিমদিকের সমগ্র অঞ্চল স্পেনের এলাকা-রূপে ঘোষণা করা হ'ল। এর ফলে আফ্রিকা ও এশিয়া পোর্তুগালের ভাগে আর আমেরিকা পড়ে স্পেনের ভাগে।

॥ অনুশীলনী ॥

- **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১. ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম কোন দেশে পৌছেছিলেন ?
২. মার্কোপোলো কোন্ দেশে প্রথম গিয়েছিলেন ?
৩. পর্তুগালের সামুদ্রিক প্রেরণা কে প্রথম দিয়েছিলেন ?
৪. উত্তমাশা অন্তরীপ নামকরণ করেন কে ?
৫. আমেরিগো ভেসপুচি কোন মহাদেশে গিয়ে উপস্থিত হন ?
৬. কলম্বাস কোন দেশ আবিষ্কার করেন ?

- **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ**

১. ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রেরণা কেন এসেছিল ?
২. কি কি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় নাবিকদের সামুদ্রিক যাত্রা সম্ভব হয়েছিল ?
৩. কলম্বাস কাদের সাহায্যে কোন দেশ আবিষ্কার করেছিলেন ?
৪. বারথেলোমিউ ডিয়াজ কে ছিলেন এবং তিনি কোন্ দেশে প্রথম পৌছান ? উত্তমাশা অন্তরীপ নামকরণ কেন হয় ?

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১. বর্তমান যুগের সূচনাতে নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের চেষ্টা কেন দেখা দিয়েছিল এবং কি কি কারণে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল ?
২. স্পেনের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩. সমুদ্র পথে নতুন নতুন দেশ আকিষ্কারের ফল বর্ণনা কর।
৪. পর্তুগীজ নাবিকেরা কোন্ কোন্ দেশ আবিষ্কার করেছিলেন ? তাদের সম্পর্কে কি জান লেখ।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. কলম্বাস—দ্বীপপুঞ্জকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে ভুল করেছিলেন।

খ. ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে—নামে এক নাবিক ব্রাজিলে এসে উপস্থিত হন।

২. সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

ক. বারথেলোমিউ ডিয়াজ ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন—

ফ্রান্স □ স্পেন □ ফিলিপাইন □ ব্রাজিল □

৪ | ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণ

দক্ষিণ ইউরোপের ইটালীর রেনেসাঁস আন্দোলন আর উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জার্মানির রিফরমেশন আন্দোলন নবজীবনের প্রেরণারই দুই ভিন্ন রূপ।

রেনেসাঁসের ফলে মানুষের মনে যে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনে। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান কারণ রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন। কারণে অকারণে পোপ মানুষকে সমাজচ্যুত করতেন। রাজাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন এবং নিজেদের আরাম বিলাসের জন্য জনসাধারণকে অর্থের জন্য নানা চাপ দিতেন। এসব মিথ্যা সংস্কারের জালে সে যুগের নবীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধরা দিলেন না।

বিখ্যাত পণ্ডিত ইরাস্‌মাস্‌ দেখেছিলেন যে জনগণের মধ্যে প্রচারিত বাইবেলের সাধারণ সংস্করণটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই ওলন্দাজ পণ্ডিত চার্চের দুর্নীতি ও অনাচরকে ব্যঙ্গ করে বই লিখেছিলেন কিন্তু তিনি ধর্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হন নি।



জন ওয়াইক্লিফ

চতুর্দশ শতাব্দীতে জন ওয়াইক্লিফ নামে অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপক প্রচলিত ধর্মের অনাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাধারণ লোক যাতে বাইবেল পড়তে ও বুঝতে পারে সেজন্য তিনি ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে

গ্রন্থটির প্রকৃত স্বরূপ কি তা বুঝতে সহায়তা করেন। ফলে ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ওয়াইক্লিফ ধর্মসংস্কার আন্দেলোনের অগ্রদূত। তাঁকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের শুকতারা বলা হয়।

ওয়াইক্লিফের অনুগামী **জন হাস্** ধর্মাধিষ্ঠান যে কেবলমাত্র যাজকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই মতবাদ অস্বীকার করেন। ধর্ম সকলের জন্য এবং পোপ ধর্মাধিষ্ঠানের প্রধান নন—হাস্ এই মতবাদ প্রচার করেন। ইরাসমাস, ওয়াইক্লিফ ও হাস্ প্রমুখ মনীষীরা ধর্মাধিষ্ঠানের পতন বা বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্মাধিষ্ঠানের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিক বল আমরা দেখতে পাই জার্মানির অন্তর্গত স্যাক্সনির এক কৃষক সন্তান **মার্টিন লুথারের** মধ্যে। মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে জার্মানিতে সংস্কার আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং লুথারই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেই ভগবানের দয়া পাওয়া যায়। তিনি একথাও বললেন যে ধর্মের ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। বাইবেল পড়লেই ধর্ম বিষয়ে সব জানা যায়—সেজন্য পোপের অধীনতা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তাঁর এই বাণী জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।



মার্টিন লুথার

১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দু'বছর পর ১৫১০ খ্রীঃ তিনি রোমান ক্যাথলিকদের কেন্দ্রস্থল রোমে যান এবং কিছুদিন বাদে ফিরে আসেন। এই সময় রোমের বিখ্যাত সেন্ট পিটার্স গির্জার নির্মাণ কাজ চলছিল। গির্জার খরচপত্র যোগানোর জন্য পোপ

জার্মানির স্যাক্সনিতে জার্মানবাসীদের নিকট টেট্‌জল বা পাপ-মুক্তির ছাড়পত্র বিক্রী করতে থাকেন। ধর্মের নামে এরকম অধর্ম লুথার সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর প্রতিবাদগুলি লিখে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলেন। লুথার ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিজের ধর্মমত প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর প্রচারিত ধর্মমত 'প্রতিবাদী খ্রীস্টধর্ম' বা 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' নামে পরিচিত।

লুথারের এই প্রতিবাদের শাস্তিস্বরূপ পোপ তাঁকে কৈফিয়ত দিতে আদেশ করলেন এবং সমাজচ্যুত করলেন। লুথারও উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে পোপের আদেশপত্র পুড়িয়ে দিলেন। চার্চের দুর্নীতি, কু-সংস্কার ও শোষণের ফলে অনেকই পোপের বিরোধী ছিলেন। দেশের অনেক মানুষ লুথারের পক্ষ নিলেন। স্যাক্সনির রাজা তাঁকে নিজ দুর্গে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

বিনা বাধায় জার্মানির নানা জায়গায় মার্টিন লুথারের ধর্মমত বিস্তার লাভ করে। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ এক সভা ডাকলেন। এই সভায় লুথার পন্থী ও থ্যাথলিক পন্থী রাজারা উপস্থিত ছিলেন। লুথার-পন্থীরা এই সভায় তাঁদের ধর্মের চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে নিরপেক্ষতার ভান করলেও পঞ্চম চার্লস্‌ শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিকদের পক্ষ নিলেন এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে এক সন্ধির দ্বারা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। এই সন্ধি দ্বারা লুথারের স্থাপিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাধিষ্ঠান আইনতঃ স্বীকৃত হ'ল এবং স্থির হল জার্মানির রাজারা নিজেদের ইচ্ছামত দুই মতবাদই গ্রহণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ প্রজার উপর চাপাতে পারেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম স্বীকৃত হওয়ায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের ধর্মীয় ঐক্যের আদর্শ নষ্ট হয়।

কেবলমাত্র জার্মানিতে নয়—ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ এবং নেদারল্যাণ্ডের কিছু অংশ রোমের ধর্মাধিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পোপের প্রাধান্যের স্থলে রাজার প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ধর্ম ব্যাপারে পোপের জায়গায় বাইবেলের প্রাধান্য স্বীকৃত হ'ল।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

প্রতিসংস্কার আন্দোলন

ক্যাথলিক চার্চের যেসব পাপ আচরণের ফলে প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মসংস্কারের সূত্রপাত হয়েছিল ঠিক সেই কারণেই প্রতিসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ক্যাথলিক যাজকশ্রেণী ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের অবনতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু পোপ কর্ণপাত করেন নি। এই অবস্থায় মার্টিন লুথার তাঁর প্রতিবাদী ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। স্পেনের রাজার চেষ্টায় স্পেনের ধর্মাধিষ্ঠানের সংস্কার শুরু হয়। এই আন্দোলন ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় রোমান ক্যাথলিক যাজকরা তাঁদের মধ্যে যে নানাবিধ দোষ-ত্রুটি ও অনৈক্য আছে তা উপলব্ধি করেন। তাঁরা চার্চের অনাচার দূর করে চার্চের ভাঙন বন্ধ করেন। এই সময় একজন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম ইগনেসিয়াজ লয়লা। তিনি জেসুইট্ নামক এক সম্প্রদায় গঠন করে ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং কাউণ্টার রিফরমেশন নামে প্রতিসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

ইন্‌কুইজিসন

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের আর একটি হাতিয়ার ছিল 'ইন্‌কুইজিসন'। ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে ধর্মদ্রোহীদের বিচারের জন্য ইনকুইজিসন নামে এক আদালত স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই প্রথা রোমান

ক্যাথলিক চার্চ খ্রীস্ট ধর্মের অংশ হিসাবে গ্রহণ করে। প্রত্যেক ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানেই একটি করে **ইনকুইজিসন** বা বিচার আদালত স্থাপিত হয়। ইন্‌কুইজিসন বিচারালয় ধর্মদ্রোহিতা দমনের নামে বর্বরতার আশ্রয় নিত। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে যাকে এই বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত করা হ'ত তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হ'ত না। বিনা অপরাধে অনেককে দোষী সাব্যস্ত করা হ'ত এবং অনেক সময় মৃত্যুদণ্ডের আদেশে বা অন্য কোন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ত। বহু ক্যালভিনপন্থীকে এই বিচারালয় কঠোর শাস্তি দিয়েছিল। যাজকদের পাপাচার থেকে মুক্ত হবার আন্দোলনে, জেসুইট্ সঙ্ঘ ও ট্রেণ্ট সভার কার্যকলাপে ক্যাথলিক চার্চ অনেকটা যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ইন্‌কুইজিসন পদ্ধতি দমনমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করায় ক্যাথলিক ধর্ম ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এক প্রবল ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল। ফলে এই ইন্‌কুইজিসন পদ্ধতি ক্যাথলিক ধর্ম পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সাফল্যলাভ করে নি। নেদারল্যাণ্ডে এই পদ্ধতিই ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের চিরতরে ক্যাথলিক ধর্মের শত্রুতে পরিণত করেছিল। ধর্মীয় বিচারের নামে ইনকুইজিসন পদ্ধতি যে বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিল ইতিহাসে তার তুলনা নাই।

জেস্যুইট্ সঙ্ঘ

প্রতিসংস্কার আন্দোলনে ইগ্‌নেসিয়াজ লয়লা স্থাপিত জেস্যুইট্ সঙ্ঘের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিখ্যাত জেস্যুইট্ সঙ্ঘ স্থাপন করেন এবং তৃতীয় পলের কাছ থেকে তাঁর সঙ্ঘের অনুমোদন লাভ করেন। এই সঙ্ঘের সদস্যদের চারটি ধর্মনীতি মেনে চলতে হ'ত। (১) চারিত্রিক পবিত্রতা, (২) স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ, (৩) আজ্ঞানুবর্তিতা এবং (৪) পোপের আদেশ পালন করা। এই কয়টি নীতি ছাড়া শিক্ষা বিস্তার, অখ্রীস্টানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং যাঁরা ক্যাথলিক

ধর্মাধিষ্ঠান পরিত্যাগ করেছেন—যেমন লুথার ও ক্যালভিন পন্থীরা, তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা। জেস্যুইটগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে স্পেন, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম লোপ পায়। হল্যাণ্ড, জার্মান, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে তাঁরা বহু প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মীকে ক্যাথলিক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন।

জেস্যুইটদের কাজ যে কেবলমাত্র ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দেশে তাদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা অসামান্য সফলতা লাভ করেন। কলকাতার বিখ্যাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ জেস্যুইটদের কীর্তি।

ট্রেণ্টের ধর্মসভা

জেস্যুইটসঙ্ঘ ছাড়া ট্রেণ্টের সভা প্রতিসংস্কার আন্দোলনের একটা যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই সভা পবিত্র সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধি নিয়ে লুথারের প্রচারিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম-সমস্যার সমাধান করা। পোপের বাধা সত্ত্বেও ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ ট্রেণ্টের সভা আহ্বান করেন। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভার কয়েকটা অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

পঞ্চম চার্লসের লক্ষ্য ছিল ট্রেণ্টের সভার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক যাজকদের সহায়তায় ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার করা; ক্যাথলিক ও লুথারের ধর্মের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করা এবং খ্রীস্টান চার্চগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। ট্রেণ্টের সভা শেষ পর্যন্ত পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং লুথারবাদকে অগ্রাহ্য করে।

এই সভার পর থেকে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে এবং জোর করে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ক্যাথলিক ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করার চেষ্টা চলে। ফলে ক্যাথলিক চার্চ ও যাজকদের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং পোপের ও ক্যাথলিক চার্চের মর্যাদা ও ক্ষমতা বেড়ে যায়।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

রাজ্যসমবায় বনাম সম্রাট পঞ্চম চার্লস্

মধ্যযুগে ইউরোপে এক ধর্মের ভিত্তিতে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পোপের হুকুম সবদেশেই ছিল অলজ্ঘনীয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সংস্কারের প্রভাবে সমস্ত খ্রীস্টানধর্ম সম্প্রদায় দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। (১) প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা লুথারের মতবাদী ও (২) রোমান ক্যাথলিক। ক্যাথলিক চার্চের পাপ আচরণের ফলে যেমন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মসংস্কারের সূত্রপাত হয়েছিল একই কারণে আবার তেমনি প্রতিসংস্কার আন্দোলনও শুরু হয়। এর ফলে বহুকাল ধরে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে।

ইউরোপে এই ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চাল্স্ কাউন্সিল অব্ ট্রেণ্ট (১৫৪৫—১৫৬৩ খ্রীঃ) বা ট্রেণ্ট সভা আহ্বান করেন। এই সভায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজকদের আমন্ত্রণ করা হয়। স্থির হয় এই সভার সিদ্ধান্ত প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মেনে নিতে হবে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজকেরা পঞ্চম চার্লসের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা অসম্ভব বুঝতে পেরে চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করার আগেই ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে মার্টিন লুথার পরলোক গমন করেন। লুথারের মৃত্যুর পর অবশ্য এই বিরোধ শেষ হয়নি; জার্মানিতে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট যুদ্ধে ক্যাথলিক পক্ষের নেতা সম্রাট পঞ্চম চার্লস প্রথমদিকে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত লুথার-পন্থীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে অগ্‌সবার্গের সন্ধির দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হল।

অগ্‌সবার্গের সন্ধি ১৫৫৫ খ্রীঃ

ইউরোপের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্মযুদ্ধে অগ্‌সবার্গের সন্ধি ১৫৫৫-র এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই সন্ধির কতকগুলো শর্ত ছিল।

এই সন্ধির শর্তানুসারে (১) লুথারের মতবাদ অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাধিষ্ঠান আইনতঃ স্বীকৃত হয়। (২) কোন ক্যাথলিক রাজ্যের কোনও প্রজা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি-সহ দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার সুযোগ দিতে হবে। (৩) কোন ক্যাথলিক যাজক বা পোপ নিজ ইচ্ছানুসারে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন। (৪) জার্মানির রাজারা নিজেদের ইচ্ছামত প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন। (৫) সকল প্রকার বিরোধ বা বিবাদ বিনাযুদ্ধে আপোষে মীমাংসা করতে হবে। অগ্‌সবার্গের সন্ধির ফলে পঞ্চম চার্লসের খ্রীস্টধর্মাধিষ্ঠানের ঐক্য স্থাপনের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হ'ল এবং চিরকালের জন্য খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের দু'দলে বিভক্ত করল।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

প্রজাতান্ত্রিক নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্রের উদ্ভব

পঞ্চম চার্লস উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে নেদারল্যাণ্ড পান। পঞ্চম চার্লসের সময় নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মবিরোধ বেশ প্রকট ছিল। তিনি এ বিরোধ কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছিলেন এবং নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেদারল্যাণ্ডবাসী পঞ্চম ফিলিপসকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত।

কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় ঘোষণা জারি করা মাত্র তাঁর প্রতি নেদারল্যাণ্ডের জনগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। ক্রমে তারা ফিলিপসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ফিলিপস্ ও তাঁর রাজ্যে ক্যাথলিক প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১২ জন বিশপ বা যাজক নিযুক্ত করেন। ইন্‌কুইজিসন নামে বিচারালয়ের সাহায্যে অ-ক্যাথলিকদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। এছাড়াও

ফিলিপ ছিলেন অত্যন্ত স্বৈরাচারী। তিনি শাসন ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে অভিজাত শ্রেণীকে সরিয়ে দিলেন। ফলে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ফিলিপ এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার জন্য তিনি অপ্রিয় হয়ে উঠেন। ফলে নেদারল্যাণ্ড অধিবাসীরা দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে। ফিলিপের বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন অভিজাতশ্রেণী, বিশেষকরে উইলিয়াম অব অরেঞ্জ। দ্বিতীয় ফিলিপ অভিজাতশ্রেণীকে শাসননীতির পরিবর্তনের আশ্বাস দিলেও কার্যত কিছুই করেন নি।

ফিলিপ হল্যাণ্ডে ইন্‌কুইজিসন স্থাপন করেন এবং দাঙ্গাকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে একজন সামরিক নেতার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। নেদারল্যাণ্ডে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং দাঙ্গাকারীদের বিচারের জন্য একটি 'কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এই সভা বিচারের নামে প্রহসন শুরু করে—বিনা দোষে অনেকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে। এজন্য এই কাউন্সিল ইতিহাসে কাউন্সিল অব্ ব্লাড নামে পরিচিত। ফিলিপ এদিকে করভারে নেদারল্যাণ্ডবাসীকে জর্জরিত করে তুললেন। ব্যবসায় বাণিজ্য একরকম অসম্ভব হয়ে উঠে এবং অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু নেদারল্যাণ্ডবাসী দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে দেশত্যাগী ইংলণ্ডে বসবাসকারী নেদারল্যাণ্ডবাসী ব্রিল শহর অধিকার করে। ব্রিল শহরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর নেদারল্যাণ্ডে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদের এক প্লাবন আসে। নেদাল্যাণ্ডের এই জাতীয় দুর্দিনে ধর্মীয় বিরোধ এক সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে ভেবে—উইলিয়াম ট্রেণ্টের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে উত্তর ও দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। কিন্তু উইলিয়ামের এই ঐক্য স্থাপনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মার্গারেটের পুত্র ডিউক অব্ পার্মা। তিনি শাসনভার গ্রহণ করার পরেই দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের সহানুভূতি পান। ফলে

উইলিয়ামের পক্ষে সমগ্র নেদারল্যাণ্ড ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। এই কারণে তিনি ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাংশের প্রোটেস্ট্যাণ্ট অংশ নিয়ে ইউট্রেক্টের ইউনিয়ন নামে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই ইউনিয়নই হল্যাণ্ড নামে পরিচিত। ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে অঞ্চলটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সন্ধিতে (১৬৪৮ খ্রীঃ) হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'ল। দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড যা পরবর্তীকালে অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ড বা বেলজিয়াম নামে পরিচিত পূর্বে ক্যাথলিক রাষ্ট্র ছিল।

● ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ●

স্পেনীয় সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ ও ইংলণ্ড

রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ইংলণ্ডের রাণী মেরীর ন্যায় গোঁড়া ক্যাথলিক। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিক প্রাধান্য বিস্তার করাই ছিল ফিলিপের জীবনের লক্ষ্য। ইংলণ্ডের রাণী মেরীরও এই একই উদ্দেশ্য ছিল। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাণী মেরী দ্বিতীয় ফিলিপকে বিয়ে করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসলে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর অভিসন্ধি সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাণী এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাণী তাঁর প্রস্তাবে রাজী হননি। ফলে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বে ফাটল দেখা দেয়। এছাড়া আরও অনেক কারণে ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।



রাণী এলিজাবেথ

প্রথমতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে মনোমালিন্য

দেখা দেয়। রাজা ফিলিপ দেশের সকল লোককে আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ী ও নাবিকেরা ফিলিপের নিষেধাজ্ঞার সম্মান রাখেনি। তারা আমেরিকায় যাতায়াত শুরু করে এবং ব্যবসাও আরম্ভ করে। এতে স্পেনীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে উভয় জাতির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের উপর দ্বিতীয় ফিলিপ সুবিচার করেননি। সেখানকার অধিবাসীরা লুথার-মতবাদ গ্রহণ করলে দ্বিতীয় ফিলিপ তাদের ক্যাথলিক ধর্ম মানতে বাধ্য করান। ফলে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাণী এলিজাবেথ এই সুযোগে গোপনে দাঙ্গাকারীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। ফিলিপ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয়তঃ রাণী মেরী মৃত্যুর পূর্বে স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে তাঁর হত্যার জন্য এলিজাবেথের উপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফিলিপ এলিজাবেথকে শত্রু মনে করতেন।

চতুর্থ কারণ, দ্বিতীয় ফিলিপের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে স্যার জন্ হকিন্স, স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক প্রমুখ নাবিক আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্য আমদানী করতেন। এতে ফিলিপ প্রচণ্ড রেগে যান এবং এলিজাবেথের কাছে অভিযোগ করেন। রাণী এলিজাবেথ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাকুক বরং এদের উৎসাহিত করতেন। এইসব কারণে ফিলিপ বিরক্ত হয়ে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে এক বিরাট নৌ-বহর প্রস্তুত করেন। স্পেনের লোকেরা এর নাম দিয়েছিল অপরাজেয় বহর। এই বহরের সেনাপতি বা অ্যাডমিরাল ছিলেন ডিউক অব্ মেডিনা সিডোনিয়া।

এদিকে ইংরেজগণ তাদের এই জাতীয় দুর্দিনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। স্পেনীয় জাহাজগুলো ছিল আকারে বিশাল এবং এগুলি দ্রুত চলাচল করতে পারত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিকেরা কয়েকখানা ছোট জাহাজে

আগুন লাগিয়ে স্পেনীয় বহরের মুখে ছেড়ে দেয়। ফলে স্পেনীয়রা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। স্পেনের এই বিরাট নৌ-বহর ইতিহাসে 'স্পেনিশ আর্মাডা' নামে পরিচিত।

স্পেনিশ আর্মাডা ধ্বংস হওয়ার ফলে স্পেনীয় সাম্রাজ্য ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হ'ল। স্পেনের পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং কিছুকালের মধ্যে ইংরেজরা সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'ল। ইংলণ্ডের জয়লাভের ফলে ইওরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রসারতা লাভ করে।

॥ অনুশীলনী ॥

● **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১. ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জার্মানির কার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ?
২. ধর্মাধিষ্ঠান যে সকলের জন্য উন্মুক্ত একথা কে প্রচার করেন ?
৩. ট্রেন্টের সভা কে স্থাপন করেন ?
৪. ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ কি ঘোষণা করেন ?
৫. স্প্যানিশ আর্মাডা কি ? কোন্ দেশের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল ?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরণের প্রশ্ন ঃ**

১. ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কেন দেখা দিয়েছিল ?
২. আগ্‌সবার্গের সন্ধির শর্তগুলি কি ছিল ?
৩. ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর।
৪. মার্টিন লুথারের বাণী কি ছিল ?
৫. পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে মার্টিন লুথারের দ্বন্দ্বের কারণ কি ছিল ?
৬. পঞ্চম চার্লসের লক্ষ্যে কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন ?
৭. প্রতি সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি ছিল ?

● **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১. কিভাবে নেদারল্যাণ্ডবাসী দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ? এর ফলাফল বর্ণনা কর।

২. স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে ইংলণ্ডের সংঘর্ষের কারণ কি ?

৩. মার্টিন লুথারের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার প্রেরণা কি ? পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কারণ কি ? তাঁর বাণী কি ছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ওয়াইক্লিফ ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের — ছিলেন।

২. মার্টিন লুথার — বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

৩. ইন্‌কুইজিশন ছিল এক — আদালত।

৪. দ্বিতীয় ফিলিপের বিরাট নৌবাহিনী — নামে বিখ্যাত।

খ. নীচের ছকের অংশ মিলিয়ে প্রকৃত বাক্য গঠন কর :

জন ওয়াই ক্লিফ	স্যাক্সনির একজন কৃষক সন্তান।
মার্টিন লুথার	জেসুইট নামে সম্প্রদায় গঠন করেন।
ইগনেসিয়াজ লায়লা	ছিলেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক।
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ	ছিলেন 'অপরাজেয়'বহরের' সেনাপতি।
ডিউক অব মেডিনা সিডোনিয়া	জেসুইটদের কীর্তি।

৫ | সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের প্রধান কারণসমূহ ঃ

স্টুয়ার্ট যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নানা অন্তর্বিপ্লব ও গৃহবিবাদের পর রাজশক্তির উপর প্রজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই যুগে প্রধানতঃ তিনটি কারণের জন্যে রাজশক্তির বিরোধ দেখা দেয়।

(১) আদর্শগত অনৈক্য—স্টুয়ার্ট রাজারা মনে করতেন যে তাঁরা ভগবানের প্রতিনিধি এবং ভগবানের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকারের বলে তাঁরা রাজপদ লাভ করেন। সুতরাং তাঁদের মতে প্রজাদের নির্বিচারে রাজার আদেশ পালন করা কর্তব্য। এ দাবী পার্লামেণ্ট মেনে নিতে রাজী ছিল না।

(২) পররাষ্ট্রনীতি—স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন ক্যাথলিক, সুতরাং তাঁরা স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ক্যাথলিক রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রির নীতি অনুসরণ করে চলতেন। প্রজাগণ স্টুয়ার্ট রাজাদের অনুসৃত এই নীতি সমর্থন করেনি। কারণ তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের শুধু ধর্মমত সম্বন্ধীয় বিরোধ ছিল তা নয়, বাণিজ্যগত বিরোধও ছিল।

(৩) ধর্মনীতি—সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় পার্লামেণ্টের অনেক সদস্যই ছিলেন পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু জেমস্ ও তাঁর বংশধরেরা এঙ্গলিক্যান চার্চের পৃষ্ঠপোষকরূপে পিউরিটান ধর্মমতে অকারণে হস্তক্ষেপ করতেন।

প্রথম জেমস ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্যও রাজায় প্রজায় এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। প্রথম চার্লস পার্লামেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী

হন। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে কমনস্ সভায় নেতৃস্থানীয় সদস্যদের গ্রেপ্তার



প্রথম জেমস



প্রথম চার্লস

করার জন্য রাজা স্বয়ং পার্লামেণ্টে উপস্থিত হন। এই ঘটনার পর রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।

• দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ •

গৃহযুদ্ধ ও ক্রমওয়েলের শাসন

চার্লসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই গৃহযুদ্ধ ন'বছর স্থায়ী হয়েছিল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে পার্লামেণ্ট সমর্থনকারী সৈন্যদল রাজশক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ১৬৪৪ খ্রীস্টব্দে স্কট্ল্যাণ্ডের সঙ্গে পার্লামেণ্টের নেতারা সন্ধি করলে স্কট্ল্যাণ্ডের সৈন্যদল পার্লামেণ্ট বাহিনীর সঙ্গে জোট বাঁধে। এর কিছুকাল পরই রাসটন মূরের যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এই বিজয়ের গৌরব প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্ট দলের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েলের প্রাপ্য। এই সময় রাজাকে উপলক্ষ করে পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দল ও উপদলের

মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে রাজা স্কট্‌দের সঙ্গে গোপনে সন্ধি করে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু রাজার সমর্থক দল প্রেস্‌টনের যুদ্ধে ক্রমওয়েলের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় রাজার প্রাণদণ্ডের বিধান হয় এবং ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী বিচারালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে হতভাগ্য চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়। চার্লসের এই প্রাণদণ্ড রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নামান্তর মাত্র। এরপর ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র বন্ধ হয় এবং অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।



অলিভার ক্রমওয়েল

ক্রমওয়েলের শাসনব্যবস্থা ও প্রজাতন্ত্র

নামে প্রজাতন্ত্রের কর্তা হলেও ক্রমওয়েল প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সামরিক পদ্ধতিতে রাজ্যশাসন শুরু করেন। ক্রমওয়েল সামরিক শক্তির বলে শাসন পরিচালনা করতেন বলে তিনি জনগণের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। রাজা চার্লসের মত তিনিও পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধ করেন, বিনা বিচারে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই অন্যায় শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারাও ছিল না।

যুদ্ধ চলাকালীন সময় কেউ নতুন পার্লামেণ্ট নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেনি। ক্রমওয়েল সে সময়ে ইংলণ্ডের অবিসংবাদি নায়ক। শেষে ক্রমওয়েল একদিন একদল সৈন্য নিয়ে পার্লামেণ্টে সসৈন্যে প্রবেশ করে সদস্যদের তাড়িয়ে দেন।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল প্রোটেক্টর হন। রিচার্ড নম্র প্রকৃতির মানুষ।



দ্বিতীয় চার্লস

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রিচার্ডের পক্ষে তা দমন করা সম্ভব হয়নি। কারণ সেনাদলের উপর রিচার্ডের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় রিচার্ড পদত্যাগ করেন। নব নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সদস্যরা দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করের। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে মে প্রথম চার্লসের পুত্র 'দ্বিতীয় চার্লস' উপাধি ধারণ করে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলে ইংলণ্ডে পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমেই তাঁর পক্ষে রাজপদ লাভ সম্ভব হয়।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮-এর ফলাফল

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই 'দ্বিতীয় জেমস্' উপাধি গ্রহণ করে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জেমস্ তাঁর ধর্মনীতির জন্য প্রজাদের বিরাগভাজন হয়ে তিন বছর রাজত্ব করার পর সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ধর্মীয় মতভেদই প্রজাদের সঙ্গে জেম্সের সংঘর্ষের প্রধান কারণ। জেমস্ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

ক্যাথলিকদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতে শুরু করেন। এতে প্রোটেস্ট্যান্ট জনমত রাজার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় জেমস বুঝেছিলেন যে শুধু ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট রাখলে চলবে না, প্রোটেস্ট্যান্টদেরও খুশী রাখতে হবে। তাই তিনি স্বাতন্ত্রবাদী ও স্বাধীন প্রোটেস্ট্যান্টদের মনস্তুষ্টি-সাধনে যত্নবান হন। কিন্তু প্রোটে-স্ট্যান্টগণ রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিপক্ষদের দলে যোগ দেন। জনশক্তির সঙ্গে রাজশক্তির মিল হওয়াতে রাজার জয়ের আর কোন আশা রইল না।


দ্বিতীয় জেমস্

এই সময় রাজার দ্বিতীয় রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলে সকলে আশঙ্কা করে যে এই পুত্রও ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পিতার মত স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এক মহাসভায় মিলিত হয়ে জেমসে্র প্রোটেস্ট্যান্ট কন্যা মেরী ও তাঁর স্বামী উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসান। দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসন ত্যাগ করে ফরাসী দেশে পলায়ন করেন। বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সম্পন্ন হয়। বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে এই পরিবর্তন হয় বলে একে রক্তপাতহীন আন্দোলন বা গৌরবময় বিপ্লব বলা হয়।

ফলাফল ঃ এই বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় জেমস্ রাজশক্তি অপব্যবহার করে শাসনতন্ত্রের অমর্যাদা করেছিলেন। তাঁর অনাচার বন্ধ করার জন্যই পার্লামেণ্টের সদস্যরা উইলিয়ামকে রাজ সিংহাসনে বসান। সুতরাং এই উপলক্ষে নতুন রাজা ও দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে শাসননীতি বিষয়ে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি বিল অব্ রাইটস্ বা 'অধিকারের বিধি' নামে আইনে বিধিবদ্ধ হয়।

বিল অব্ রাইটস্ নিয়ম তন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। এতে রাজার অধিকার সঙ্কুচিত হয় এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইলংণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের পরম মিত্রতা স্থাপিত হয়। পরে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড একত্রিত হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংলণ্ড পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে এবং সমুদ্রপথে আধিপত্য লাভে ও বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. স্টুয়ার্ট রাজারা কি মনে করতেন ?

২. চার্লসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ কি নামে পরিচিত ?

৩. অলিভার ক্রমওয়েল কে ? তিনি কি করেছিলেন ?

৪. প্রথম চার্লসের পুত্র কি উপাধি ধারণ করেছিলেন ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১. প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে প্রজাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কারণ কি ?

২. কিভাবে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

৩. দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল ? এর ফলাফল বর্ণনা কর।

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজা-প্রজার মধ্যে সংঘর্ষ কেন হয় ? গৌরবময় বিপ্লব বলতে কি বোঝা ?

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

ক. সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দাও ঃ

১. সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় পার্লামেন্টের অনেক সদস্যই ছিলেন—
ক্যাথলিক □ প্রোটেস্ট্যান্ট □ পিউরিটান □

২. অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়—
স্বৈরতন্ত্র ☐ রাজতন্ত্র ☐ সাধারণতন্ত্র ☐

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রথম চার্লসের পুত্র — উপাধি ধারণ করেন।

২. প্রথম চার্লস — ক্ষমতা খর্ব করে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হন।

৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে — শিরশ্ছেদ করা হয়।

———

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)

বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবর তাঁর পিতৃরাজ্য মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ফরগণার সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় ভারতবর্ষে দুর্বল লোদী বংশীয় শাসক ইব্রাহিমের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাবর ভারত আক্রমণ করেন ও দিল্লীর নিকট পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন (১৫২৫ খ্রীঃ)। এটাই প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ। এই সময়ে মেবারের বীর রাণা সংগ্রাম সিংহ বাবরকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।



বাবার

বাবর আফগান শক্তি ধ্বংস করে ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করার আগেই ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অসাধারণ বীর সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন। তুর্কী ভাষায় রচিত তাঁর জীবন-স্মৃতি বাবর-নামা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।



হুমায়ুন

হুমায়ুন ঃ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি পিতার মতই

সাহসী ও বীর ছিলেন। হুমায়ুন প্রথমে বাহাদুর শাহকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই সময় পূর্ব ভারতে শের খাঁ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেন। হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর দু'বার যুদ্ধ হয়। কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁ হুমায়ুনকে দারুণভাবে পরাজিত করেন। রাজ্য ছেড়ে হুমায়ুন তখন পারস্যে আশ্রয় নেন।

শেরশাহ্ঃ হুমায়ুন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে শের খাঁ **শেরশাহ্** উপাধি ধারণ করে হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়ে বসেন। তিনি সুরবংশীয় আফগান ছিলেন। তাঁর পিতা বিহারের অন্তর্গত সাসারামের একজন সামান্য জায়গীরদার ছিলেন। বাল্যকালে বিমাতার বিরাগভাজন হয়ে শেরশাহ্ বা ফরিদ গৃহত্যাগ করেন। তিনি বিহারের আফগান সুলতান বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরী নেন। এই সময় একাকী বাঘ শিকার করে তিনি শের খাঁ উপাধি লাভ করেন।



শেরশাহ

শের খাঁ বীর যোদ্ধা ছিলেন। ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে চৌসা ও ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে বিল্বগ্রামে শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। বিল্বগ্রামে যুদ্ধের পর শের খাঁ **শেরশাহ্** উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি মালব, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, আগ্রা, দিল্লী ও বুন্দেলখণ্ড জয় করেন। এভাবে তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন।

দক্ষ শাসকরূপেও তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্যশাসনে নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করে দেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি দেশের পথঘাটগুলির উন্নতি সাধন করেন এবং কয়েকটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। মুদ্রা ও ডাক বিভাগের এবং দেশে শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করেন।

শেরশাহের প্রধান কৃতিত্ব হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজাকে সমান চখে দেখা। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে আকবর শেরশাহের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী রাজ্য উদ্ধার করে ভারতে আবার মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

আকবর ঃ হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর তের বছরের পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। একমাত্র বালক সম্রাটের সুদক্ষ অভিভাবক বৈরাম খাঁর জন্যই মোগল শক্তি রক্ষা পায়। বৈরাম খাঁ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) শেরশাহের বংশধর আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। আকবরকে এইজন্যই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পর আকবর আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর অধিকার করেন। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে আকবর মালব জয় করেন এবং ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করেন। ১৫৬৭ খ্রীঃ আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ ও অবরোধ করেন। রাজপুত নেতারা বীরত্বের সঙ্গে চিতোর রক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত মোগল বাহিনী চিতোর অধিকার করলে রাজপুত রমণীরা 'জহরব্রত' অবলম্বন করে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন।


আকবর

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর মেবারের রাজা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহ। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হলেও রাণা প্রতাপ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মেবার উদ্ধারের জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রতাপসিংহের বীরত্বের কথা

ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে। আকবর গুজরাট, কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি জয় করেন। এইভাবে আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করে।

আকবর ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগর আক্রমণ করলে সুলতানের অভিভাবিকা চাঁদবিবি অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে রাজধানী রক্ষা করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। দাক্ষিণাত্যেও আকবরের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

প্রজারঞ্জক শাসক হিসাবে ভারতের ইতিহাসে আকবরের মত সম্রাট বিরল। আকবর নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি গুণীর সমাদর করতেন। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুসাশনের জন্য তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। আকবর হিন্দু মুসলমান সকলকে সমানভাবে দেখতেন। ফতেপুর-সিক্রীতে **ইবাদৎখানা** নামে একটি উপাসনাগার নির্মাণ করেন ও সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে **'দীনইলাহী'** নামে এক নতুন ধর্মমত গঠন করেন। হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়ে একটি মহান ভারতীয় জাতি গড়ে উঠুক, এই ছিল আকবরের শাসনের মূলনীতি।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান ঃ আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনিও রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রধান সাফল্য মেবারের রাণা বীর প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহের বশ্যতা স্বীকার, বঙ্গদেশে আফগান বিদ্রোহের অবসান ঘটানো।



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বহু পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ, দয়াপ্রবণ হলেও অন্যদিকে নিষ্ঠুর ও নির্মম হতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি বিদ্যা ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন

ও ন্যায় বিচারের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সাহিত্য ও চিত্রশিল্পেও ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর রচিত আত্মজীবনী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। ধর্মবিষয়ে তিনি ছিলেন পিতার ন্যায় উদার। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়কেই তিনি সমান চোখে দেখতেন।

শাহ্‌জাহান: ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **শাহ্‌জাহান** সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় শাহ্‌জাহান একদিকে যেমন নির্মম ও নিষ্ঠুর ছিলেন আবার অন্যদিকে সুশাসক ও প্রজাহিতৈষীও ছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে শিল্পোন্নতি অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। আগ্রায় তাজমহল, মতি মসজিদ, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি তাঁর গভীর শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করে।



শাহ্‌জাহান

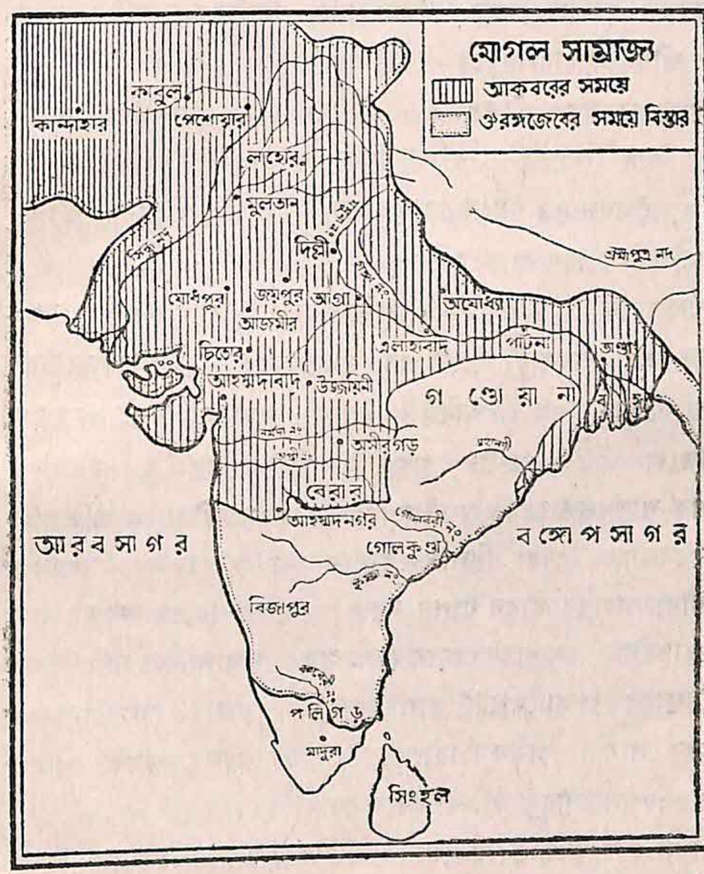
সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি তুর্কী, ফরাসী এবং হিন্দী—এই তিনটি ভাষা জানতেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি ও গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠে। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় এবং সমগ্র রাজ্যটি মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। তারপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন।



ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেব : আকবরের মত ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দু'টিকেও ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। এরপর সুদূর তাঞ্জোর পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

ঔরঙ্গজেব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও দক্ষ শাসক ছিলেন। রাজনৈতিক



চাতুর্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না এবং তাঁর কার্যক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ধর্মবিষয়ে ঔরঙ্গজেব খুব গোঁড়া ছিলেন। পরধর্মের প্রতি তাঁর একটুও উদারতা ছিল না। ঔরঙ্গজেবের এই ধর্মান্ধতা মোগল সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ বলে ধরা হয়। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

মোগল যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন ও বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ

ইংরেজ রাজদূত হকিন্স ও স্যার টমাস রো, ফরাসী পর্যটক টেভার্নিয়া ও বার্নিয়া প্রভৃতি বিদেশীরা মোগল যুগে ভারতে আসেন। তাঁদের লিখিত বিবরণী থেকে একদিকে মোগল দরবারের জাঁকজমকের সংবাদ যেমন পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোগল দরবারের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের কথা বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা লিখে গেছেন। রালফ ফিচ্ আকবরের সময়ে ভারতে আসেন। ইংরেজ দূত টমাস রো ও ফিচ্ মোগল দরবারের জাঁকজমকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

তখন সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ধনী-সম্ভ্রান্ত-অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং জনসাধারণ। মোগল সম্রাটেরা সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সম্রাটের পরেই সমাজের অভিজাত্যরা। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমীর ওমরাহরা, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা বিলাস ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরা সাধারণ জীবন যাপন করত। জনসাধারণের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সাধারণ লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল না। কৃষক ও দিনমজুরের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, এরাই ছিল সমাজের নিম্নস্তরের লোক। রাজকর্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজা, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি দুরবস্থায় জীবন অতিবাহিত করত।

মোগল যুগে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। বর্তমান যুগের মত মধ্যযুগেও অধিকাংশ দেশবাসী কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল।

বহির্বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হওয়ায় ধনরত্নের অভাব ছিল না। কার্পাস-বস্ত্র উৎপাদন মোগল যুগের সবচেয়ে বড় শিল্প ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাগজ, রেশমী-বস্ত্র, শাল, গালিচা, মদ, চিনি, জুতা ও গন্ধদ্রব্য প্রচুর উৎপাদন হত। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ঐশ্বর্যের

ছড়াছড়ি দেখা যেত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা আর জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা—এই ছিল মোগল যুগের সমাজচিত্র।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি (১৭০৭-১৭৫৭ খ্রীঃ)

বাবরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য আকবরের রাজত্বকালে বিকাশ লাভ করে ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সর্বাধিক বিস্তারলাভ করে। কিন্তু আবার ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে।

আকবরের ধর্মনীতি ও হিন্দুদের প্রতি উদারতা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করেছিল। কিন্তু ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে হিন্দুরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মারাঠা বীর শিবাজী ও পাঞ্জাবে নবম গুরু গোবিন্দের অধীনে এক সঙ্ঘবদ্ধ শিখবাহিনী। এইভাবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

তাছাড়া মোগল বাহিনীর বাইরে জাঁকজমকের প্রাধান্য থাকায় বিলাসিতা ও কলহের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতাও পতনের আর একটি কারণ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সংবাদ আদান-প্রদান করা সহজসাধ্য ছিল না। বিস্তৃত সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী সকলেই দুর্বল শাসক ছিলেন। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসন কর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মোগল অভিজাতদের স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল। সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ দিল্লী অধিকার করে লুণ্ঠন করেন। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ শাহ্ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। নাদির শাহের আক্রমণের কিছুকাল পরে

আফগানিস্থানের রাজা আহম্মদ শাহ্ আবদালী মোগলদের অধিকার থেকে পাঞ্জাব কেড়ে নেন। তিনি আরও কয়েকবার দিল্লী লুণ্ঠন করেছিলেন। এভাবে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে শেষ মোগল নবাব দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে ইংরেজরা নির্বাসিত করে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

ভারতে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির অনুপ্রবেশ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ভারতে পোর্তুগীজ বণিকগণ : মোগল যুগের একটি বিশেষ ঘটনা হ'ল ইউরোপীয় বণিক ও ভ্রমণকারীগণের ভারতে আগমণ। পোর্তুগীজরা মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই এসেছিল। মোগলযুগে তারা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ বণিক ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে কেব্রাল কোচিনে পোর্তুগীজদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। আলবুকার্ক ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পোর্তুগীজ গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং সমৃদ্ধিশালী বন্দর গোয়া অধিকার করে এদেশে পোর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া দমন, দিউ, বোম্বাই এবং বাংলাদেশের হুগলী প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজরা কুঠি স্থাপন করে। পোর্তুগীজরা ব্যবসার নামে লুণ্ঠন, নরহত্যা এবং দাস-ব্যবসা করত। বহু ভারতবাসীকে জোর করে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করত। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট শাহ্‌জাহান তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন। এর ফলে ভারতে পোর্তুগীজদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়।

ওলন্দাজ বণিকগণ : ভারতে ওলন্দাজদের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ উপকূলে নাগাপট্টম এবং বাংলাদেশের চুঁচুড়ায়। পরে ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের সংঘর্ষের ফলে ভারতে ওলন্দাজ কুঠিগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজরা সুমাত্রা

অঞ্চলের ইংরেজ কুঠিগুলির বিনিময়ে ভারতের সমস্ত ওলন্দাজ কুঠি ইংরেজদের কাছে বিক্রী করে।

দিনেমার বণিকগণঃ বাণিজ্য প্রসারের প্রয়াসে দিনেমারগণ ভারতে কয়েকটী কুঠি নির্মাণ করেছিলেন। এই কুঠিগুলির মধ্যে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঞ্জোর এবং বাংলাদেশের শ্রীরামপুর কুঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে দিনেমাররা তাঁদের সমস্ত উপনিবেশ ইংরেজদের কাছে বিক্রী করেছিলেন!

ফরাসী বণিকগণঃ ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বণিকেরা পণ্ডিচেরীতে একটি কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করেন। অন্যান্য ফরাসী বাণিজ্য কুঠিগুলির মধ্যে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের চন্দননগর এবং মালাবার অঞ্চলের কয়েকটি কুঠি উল্লেখযোগ্য। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য পতনের যুগে ভারতবর্ষের রাজত্ব নিয়ে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত ফরাসীরা পরাজিত হয় এবং ইংরেজরা এদেশে রাজ্য স্থাপনের সুযোগ লাভ করে।

ইংরেজ বণিকগণঃ ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সনদ লাভ করে ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা প্রথম জেম্সের পরিচয় পত্র নিয়ে ক্যাপ্টেন হকিন্স সুরাটে আসেন। ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে সুরাটে বাণিজ্যের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মসলিপট্টমে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেন।

১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে মোগল রাজসভায় ইংলণ্ডের প্রথম জেমসের দূতরূপে স্যার টমাস রো এদেশে আসেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর টমাস-রোকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ইংরেজরা আগ্রা, আহম্মদাবাদ, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মাদ্রাজ), হরিহরপুর, বালেশ্বর, হুগলী, পাটনা ও কাশিমবাজারে একে একে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক সুতানুটি গ্রামটি পরিদর্শন

করেন এবং ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের ফরমান বলে এখানে একটি কুঠি নির্মাণ করেন। স্থানীয় সুবর্ণ বণিকদের কাছ থেকে বার্ষিক বারো শত টাকা খাজনায় ইংরেজরা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালী-



জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো

ঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন এবং তিনটি গ্রামের সমন্বয়ে জব চার্ণক কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন। ক্রমে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ ও ফরাসীদের পণ্ডিচেরী। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি দু'টির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে এই দু'টি শক্তির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। তাঞ্জোরের কাছে বন্দীবাসের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি লালি ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। ফলে ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মারাঠাবীর শিবাজীর

নেতৃত্বে মারাঠারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ও দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।

শিবাজী ঃ ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে শিবনের গিরিদুর্গে মারাঠা কুলতিলক শিবাজীর জন্ম। তিনি পুণা ও কর্ণাটকের জায়গীরদার শাহজীর পুত্র। শিবাজীর চরিত্র গঠনে তাঁর বুদ্ধিমতী মাতা জিজাবাঈ-এর গভীর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। মার কাছে বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনে কিশোর বয়সেই শিবাজীর মনে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের আকাঙ্খা জন্মে। দাদাজী কোণ্ডদেব নামে জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বে তিনি কৈশোর অতিবাহিত করেন এবং যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ ও কুস্তিবিদ্যায় বাল্যকাল থেকে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।



শিবাজী

কিশোর বয়সে তিনি পার্বত্য মাওয়ালীজাতীয় লোকদের নিয়ে একটি নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন। এদের সাহায্যে পুণার কাছে তোরণ দুর্গ এবং পরে সিংহগড়, চারুণ ও পুরন্দর দুর্গগুলি অধিকার করেন। তিনি রামগড়, প্রতাপগড় এবং রায়গড়ে তিনটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। শিবাজী এইসময় মোগল রাজ্যে অভিযান করলে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিবাজী মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করলে শিবাজী আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং দাক্ষিণাত্যের বহু অঞ্চল অধিকার করেন। ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে বিজাপুরের সুলতান ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবাজী কৌশলে আফজল খাঁকে

হত্যা করেন এবং বিজাপুর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। বিজাপুরের সুলতান তখন সন্ধি করে পুণা থেকে গোয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের আধিপত্য শিবাজীকে দিতে বাধ্য হন।

দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর শক্তি বিস্তারে আতঙ্কিত হয়ে ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে)। শিবাজীর হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে শায়েস্তা খাঁ দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করেন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করলে ঔরঙ্গজেব অম্বররাজ জয়সিংহ ও বিখ্যাত সেনাপতি দিলওয়ার খাঁকে প্রেরণ করেন। জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলে শিবাজী ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। জয়সিংহের অনুরোধে তিনি আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু সম্রাট তাঁকে অপমান করে তাঁর পুত্র শম্ভূজীসহ নজরবন্দী করে রাখেন। শিবাজী কৌশলে মোগলদের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে মোগেলদের বিরুদ্ধে শিবাজী আবার যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি ১৬৭৪ খ্রীঃ রায়গড়ে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করে 'ছত্রপতি শিবাজী' উপাধি ধারণ করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

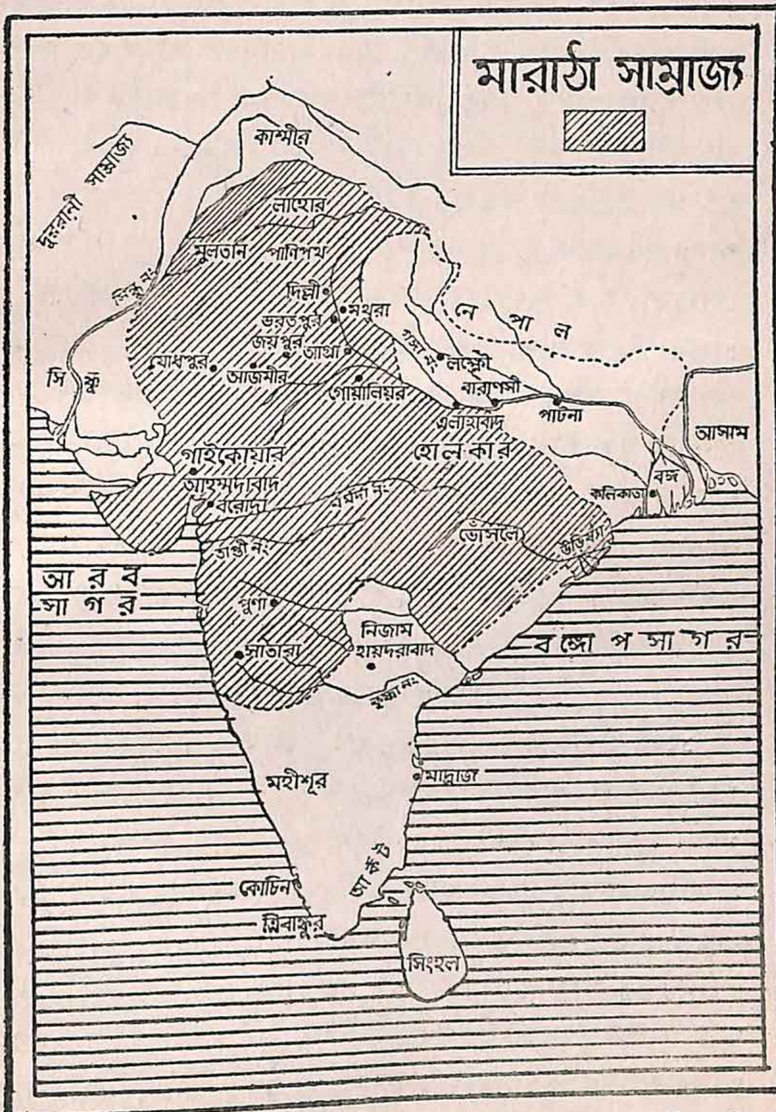
শিবাজী যে শুধু বীর যোদ্ধা এবং সমরকুশলী সেনাপতি ছিলেন তা নয়, রাজ্যশাসনেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে জমির উৎপাদন শক্তি অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করতেন।

অসাধারণ বীরত্ব বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে শিবাজী এক ঐক্যবদ্ধ মারাঠা শক্তি গঠন ক'রে তাদের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন।

শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ

শম্ভুজী ঃ (১৬৮০-১৬৮৯ খ্রীঃ) ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী রাজা হন। শম্ভুজীর অকর্মণ্যতার ফলে মহারাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঔরঙ্গজেব শম্ভূজীর বিরুদ্ধে অগ্রসন হন। যুদ্ধে শম্ভুজী পরাজিত হন এবং মোগলরা তাঁকে বন্দী

করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে (১৬৮৯ খ্রীঃ)। মারাঠারা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা শম্ভুজীর ভাই রাজারামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ক'রে মোগলদের ক্রমাগত বিড়ম্বিত করতে থাকেন।



রাজারাম ঃ (১৬৮৯-১৭০০ খ্রীঃ) শম্ভুজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর অপর পুত্র রাজারাম ও পত্নী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেন। রাজারাম প্রথমে জিঞ্জি দুর্গে রাজধানী স্থাপন করে মারাঠা নায়কদের

সহায়তায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু আট বছর যুদ্ধের পর মোগল সেনাপতি জুলফিকার খাঁ জিঞ্জি দুর্গ অধিকার করলে রাজারাম সেই স্থান পরিত্যাগ করে সাতারাতে রাজধানী স্থাপন করে মোগল শক্তি বিপর্যস্ত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সাতারাসহ আটটি দুর্গ অধিকার করতে সক্ষম হন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১৭১৬ খ্রীঃ) : রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ নিজ শিশু পুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তারাবাঈ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে মোগলদের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করে চলেন। মারাঠা শক্তি দমনের চেষ্টা করে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ব্যর্থ হন। নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরে ঔরঙ্গজেবের ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে মুক্তি দিলে শাহু দেশে ফিরে সিংহাসন দাবি করেন। তারাবাঈ এই দাবি অস্বীকার করলে মারাঠাদের মধ্যে এক অন্তর্যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় শিবাজীর মৃত্যু হয়।

● ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ●

শিখদের উত্থান ও সংগঠন

১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে গুরু নানক মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নিজের দুই পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করে অঙ্গদকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করে যান। অঙ্গদ (১৫৩৮—১৫৫২) শিখদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিংবদন্তী অনুসারে অঙ্গদই গুরুমুখী বর্ণমালার উদ্ভাবক। তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫৫২—১৫৭৪) একজন আদর্শচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়ে শিখধর্মের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪—৮১) সম্রাট-আকবরের অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন। ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে রামদাসকে আকবর অমৃতসরে সরোবরসহ একখণ্ড ভূমি দান করেছিলেন। এই জায়গাতেই শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। রামদাসের সময় থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের গুরু তাঁর পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ

করতে থাকেন। রামদাস তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুনকে শিখ সম্প্রদায়ের গুরু হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১—১৬০৬) অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময় পাঞ্জাবের সর্বত্র শিখ ধর্ম প্রসারলাভ করে এবং শিখ সম্প্রদায়ের বৃদ্ধিসাধন ঘটে। অর্জুন ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ সাহেব' সংকলন করেন।

অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দের (১৬০৬-১৬৪৫) নেতৃত্বে শিখরা একটি সামরিক সম্প্রদায়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। হরগোবিন্দ সম্রাট শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অমৃতসরের নিকট যুদ্ধে (১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে) মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। হরগোবিন্দের পর যথাক্রমে হররায় (১৬৪৫—১৬৬১) এবং হরকিষণ (১৬৬১—১৬৭৪) শিখগুরুরূপে অধিষ্ঠিত হন। এরপর এলেন তেগবাহাদুর। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতিতে উত্যক্ত হয়ে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তেগবাহাদুরের ছেলে গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখদের নতুন 'খালসা' নামে ভ্রাতৃত্বের উদ্ভাবক। তিনিও মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। মোগল সম্রাট তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ মোগলদের হাতে পরাজিত হন। তাঁর দুই পুত্রকে বন্দী করে মোগলরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে এক আততায়ীর হাতে গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু হয়।

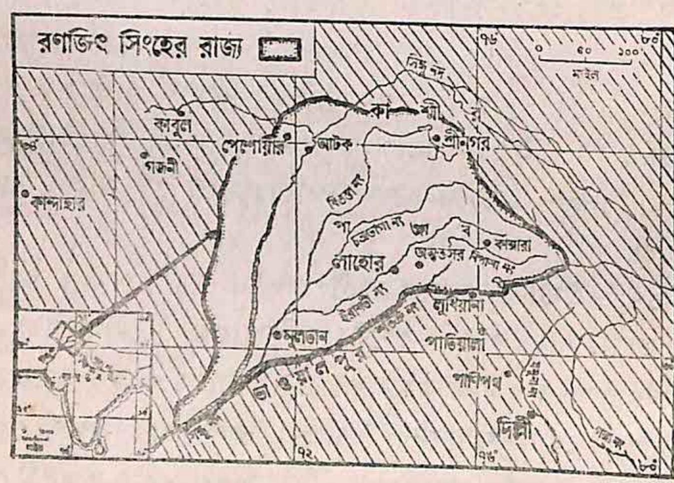
১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে শিখদের জাতীয় জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। মোগলরা কখনও শিখদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেনি। নাদির শাহের আক্রমণের পর পাঞ্জাবে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল শিখরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু শিখরা এসময় কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত ছিল। রণজিৎ সিংহ এদের সংঘবদ্ধ করে পরবর্তীকালে শিখদের একচ্ছত্র অধিপতি হন।

রণজিৎ সিংহ : ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় রণজিৎ সিংহের জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ বিভিন্ন শিখদল বা সিস্‌লকে একত্র করে পাঞ্জাবে এক পরাক্রান্ত শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রণজিৎ সিংহ আফগানদের পরাজিত করেন এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করেন। শিখরা কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী হয়নি। তিনি তাদেরও অধীনে আনতে চেষ্টা করলে শিখরা ইংরেজদের শরণাপন্ন হয়।



রণজিৎ সিংহ

অবশেষে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংরেজদের অমৃতসরে সন্ধি হয়। ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পর রণজিৎ পেশোয়ার ও মূলতান (১৪১৮ খ্রীঃ) জয় করেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে একটি শক্তিশালী শিখরাজ্য গড়ে ওঠে। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহস ও



অধ্যবসায়ের বলে রণজিৎ সিংহ অতি সামান্য অবস্থা থেকে রাজপদে উন্নীত হয়েছিলেন। শুধু সুনিপুণ যোদ্ধা হিসাবেই নয়, সুশাসক হিসেবেও তিনি প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২. কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয় ?
৩. শেরশাহের প্রকৃত নাম কি ?
৪. দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে কার জয় হয় ?
৫. কোন্ মোগল সম্রাটের সময়ে সমৃদ্ধি ও গৌরব উচ্চ শিখরে উঠেছিল ?
৬. মোগলবংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট কে ?
৭. কার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১. 'দীন-ই-ইলাহী'র প্রবর্তক কে ? 'দীন-ই-ইলাহী' বলতে আমরা কি বুঝি ?
২. ঔরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মনীতির কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ?
৩. শাহাজাহানের রাজত্বকালে স্থাপত্য শিল্পের কি কি উন্নতি ঘটেছিল ?
৪. কোন্ কোন্ বিদেশী বণিকগণ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ? সেই সময়ে কোন্ বিদেশী শক্তি ভারতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে ?
৫. শিবাজীর জন্ম কোথায় ? ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ কি কারণে ?
৬. রণজিৎ সিংহ কে ? তিনি কেন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. বিদেশী পর্যটকদের বিবরণগুলি থেকে আমরা মোগল যুগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জানতে পারি ?
২. মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কি চিত্র আমরা পাই ?
৩. মোগল সাম্রাজ্য পতনের মূল কারণ কি ? আকবরকে শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট বলা হয় কেন ?
৪. শিবাজী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় — খ্রীস্টাব্দে।
খ. শেরশাহ্ — খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন।
গ. ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে আকবর — যুদ্ধে রাণাপ্রতাপকে পরাজিত করেন।
২. সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও ঃ
ক. মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৬/১৫২৮/১৫৩০ খ্রীঃ।
খ. শিবাজী বেঁচেছিলেন প্রায় ৪৩/৫৩/৬৩ বছর।
গ. নাদির শাহ দিল্লীতে প্রবেশ করেন ১৭০৭/১৭২৭/১৭৩৯ খ্রীঃ।

৭ | ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত)

কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজদের সাফল্য : মোগল সাম্রাজ্য পতনের যুগে দেশের স্থায়ী শাসন ব্যবস্থার অভাব ঘটলে, স্থানীয় শাসনকর্তারা অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সুযোগে যে ইউরোপীয় বণিকদল ভারতবর্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে এসেছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক শান্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ডুপ্লে নামে এক ফরাসী শাসন-কর্তা। তিনি স্থির করেন, যুদ্ধবিগ্রহে দেশীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করলে এদেশে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করা সহজ হবে। ডুপ্লের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ইংরেজদের সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ-ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।



ডুপ্লে

এই সময় দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ উপলক্ষ করে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধে কর্ণাটকের সিংহাসন প্রার্থী চাঁদা সাহেব ও আনোয়ারউদ্দীনের মধ্যে সিংহাসন লাভের দ্বন্দ্বে সাহায্যের আবেদনে ইংরেজরা আনোয়ার উদ্দীনের পক্ষ এবং ফরাসীরা চাঁদা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আই-লা-সাপেলের সন্ধি দ্বারা ইউরোপের যুদ্ধের অবসান

হলে ভারতেও ইংরেজ-ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ডুপ্লে মাদ্রাজ ইংরেজদের ফেরৎ দেন।

ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের উত্তরাধিকারের গোলযোগে ইংরেজ ও ফরাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারদের পক্ষ সমর্থন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফরজঙ্গের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। কর্ণাটকের সিংহাসন নিয়ে আনোয়ারউদ্দীন ও চাঁদা সাহেবের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয়। ফলে কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হয়। এই সুযোগে রবার্ট ক্লাইভ তাঁর অসাধারণ রণদক্ষতা ও প্রতিভাবলে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করে নেন এবং কর্ণাটকে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।


ক্লাইভ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত হলে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। এই যুদ্ধ কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ক্লাইভ ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর দখল করেন। ফরাসী সেনাপতি কাউন্ট লালী ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ জয় করলেও তাঞ্জোরের অভিযানে ব্যর্থ হন। তাঞ্জোরের কাছে বন্দীবাসের যুদ্ধে লালী সম্পূর্ণ পরাজিত হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। এই সঙ্গে ভারতে ফরাসী প্রতিপত্তিরও চিরদিনের মত লুপ্ত হয়।

ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের সূচনা: ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের শাসক আলিবর্দী খাঁ নামেমাত্র দিল্লীর বাদশাহের অধীনে

থেকে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতেন। আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে ইংরেজদের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। উপরন্তু আলিবর্দী খাঁ ইংরেজ কোম্পানীকে মারাঠা খাল খনন এবং কাশিম বাজারের কুঠিরের চারিদিকে প্রাচীর তৈরীর অনুমতি দিয়েছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের কারণঃ নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লা বাংলার মসনদ লাভ করেন (১৭৫৬ খ্রীঃ)। এই সময় ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়। তাঁরা নিজ নিজ বাণিজ্য কুঠির নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করে। সিরাজ তাদের নিষেধ করলে ফরাসীরা এই আদেশ পালন করে কিন্তু ইংরেজরা তাঁর অনুমতি না নিয়েই ফোর্ট উইলিয়ামের সংস্কারসাধন আরম্ভ করে। এতে নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এছাড়া নবাবের শত্রু কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা নবাবের হাতে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হয়। এইসব কারণে ইংরেজদের প্রতি সিরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।



সিরাজদ্দৌলা

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন। কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য রবার্ট ক্লাইভ এবং নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন বাংলাদেশে বিপুল সৈন্যসহ উপস্থিত হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিরোধ না করে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলে ক্লাইভ সহজেই কলিকাতা অধিকার করেন। ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের আলিনগরের সন্ধি হয় (১৭৫৭ খ্রীঃ)।

প্রথম থেকেই সিরাজের নবাবী লাভে বাংলাদেশের হিন্দু কর্মচারী-গণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা গোপনে কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। নানা কারণে ইংরেজরাও নবাবের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ক্লাইভ ও মীরজাফরের মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে স্থির হয় সিরাজকে পদচ্যুত করে ইংরেজরা মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের নবাব করবেন, বিনিময়ে কলিকাতায় ইংরেজদের অপ্রতিহত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ দেবেন মীরজাফর। এই গোপন চুক্তি সম্বন্ধে সিরাজ কিছুই জানতেন না।

সব কিছু স্থির হবার পর ক্লাইভ সৈন্যসামন্ত নিয়ে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন। মুর্শিদাবাদ থেকে তেইশ মাইল দূরে পলাশীর আমবাগানে দুপক্ষের যুদ্ধ হয় (২৩ শে জুন ১৭৫৭ খ্রীঃ)। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ না করে দাঁড়িয়ে থাকেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে সিরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সিরাজের পরে মীরজাফর নবাব হলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভ-ই বাংলা-দেশের শাসনকর্তা হলেন।


মীরজাফর

বাংলাদেশে এবং কর্ণাটকে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা হলেও ইংরেজদের ক্রমাগত রাজ্যজয়ের ফলে লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমকে পরাজিত করেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ১২ই আগষ্ট স্বাক্ষরিত সন্ধির শর্তানুসারে সম্রাট শাহ আলমকে বাৎসরিক

ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে।

ওয়ারেন হেস্টিংস ঃ ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর দীর্ঘ তের বৎসর (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) শাসনের সময় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দোলার কাছ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়ে হেস্টিংস তাঁকে রোহিলাখণ্ড বিজয়ে সাহায্য করেন। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজরা সালসেট ও বেসিন পায়। হেস্টিংসের শাসনকালে মহীশূরে হায়দার আলী নামে এক পরাক্রান্ত সুলতানের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজরা হায়দার আলীর অধীনে স্বাধীন মহীশূরের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। হায়দার আলীর সঙ্গে ইংরেজদের দু'বার যুদ্ধ হয়। হায়দার আলী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। ভারতে ইংরেজদের শক্তি প্রসারে হেস্টিংসের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



ওয়ারেন হেস্টিংস

লর্ড কর্ণওয়ালিস ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় মহীশূরের টিপুসুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৭৯০—৯২ খ্রীঃ)। মহীশূরের পূর্ব শত্রু নিজাম ও মারাঠা ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে টিপু ইংরেজদের মিত্ররাজ ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে কর্ণওয়ালিশ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পরাজিত টিপু সন্ধি করতে বাধ্য হন (মার্চ ১৭৯২ খ্রীঃ) এই যুদ্ধ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮—১৮০৫ খ্রীঃ) **ঃ** গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লী ছিলেন চরম সাম্রাজ্যবাদী। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির

সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন করেন। মূলত ওয়েলেস্‌লী বশ্যতামূলক মৈত্রীর সাহায্যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করেন। টিপু স্থলতান এরূপ অসম্মানজনক মিত্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে পুনরায় টিপু স্থলতানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ মহীশূরের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৯৯ খ্রীঃ)। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম্ রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে টিপু স্থলতান যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। টিপুর মৃত্যুর পর মহীশূরে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন বাধা থাকে না।

ওয়েলেস্‌লীর বশ্যতামূলক 'মৈত্রীনীতির' শর্তানুসারে মৈত্রীবদ্ধ প্রত্যেক ভারতীয় রাজা হবেন ইংরেজদের আশ্রিত, আশ্রিত রাজাকে সকল প্রকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একদল ইংরেজ সৈন্য রাজ্যে মোতায়েন রাখতে হবে এবং মিত্ররাজকে ঐ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহনের নিমিত্ত রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে। প্রথমে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও ক্রমান্বয়ে অযোধ্যার নবাব এবং নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর পেশওয়া, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া এবং ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজা ইংরেজদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক মৈত্রতা সম্পাদন করেন।



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ওয়েলেস্‌লীর পরবর্তী গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে লর্ড ময়রা (হেস্টিংস ১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) ওয়েলেস্‌লীর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী ও নেপালের মধ্যে গুর্খা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে গুর্খারা পরাজিত হয়ে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী অঞ্চল ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী গভর্ণর লর্ড হেস্টিংসের সময়ে পেশওয়া, ভোঁসলে, সিন্ধিয়া এবং হোলকার পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করলে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৭—১৮১৮ খ্রীঃ) সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে পেশওয়া পরাজিত

হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। লর্ড হেস্টিংস ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে সন্ধি করে ব্রিটিশের-অধীন মিত্র রাজ্যে পরিণত করেন।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৮৫৭ পর্যন্ত)

লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩—১৮২৬ খ্রীঃ): লর্ড আমাহার্স্টের শাসনকালের প্রধান ঘটনা প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্ম-দেশীয়রা আসাম জয় করে এবং ইংরেজদের নিকট ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার ছেড়ে দেবার জন্য দাবী জানায়। এই কারণে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে এবং ইয়ান্দাবোর সন্ধির দ্বারা ব্রহ্মবাসীরা সমস্ত টেনা-সেরিম, আরাকান ও আসাম ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব প্রসারিত হয়।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮—১৮৩৫ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কোন ব্যয়বহুল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। দেশীয় প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বেন্টিঙ্ক কাছাড় (১৮০৩ খ্রীঃ) মহীশূর (১৮০৩ খ্রীঃ) এবং কুর্গ (১৮৩৫ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বেন্টিঙ্ক স্বদেশে ফেরার পর স্যার চার্লস মেটকাফ কিছুকালের জন্য গভর্ণর জেনারেলের কাজ করেন (১৮৩৫—১৮৩৬ খ্রীঃ)। মেটকাফের পরবর্তী গভর্ণরজেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের (১৮৩৬—১৮৪২ খ্রীঃ) সময় ইংরেজরা ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অকল্যাণ্ডের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজ আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ও আফগানদের মধ্যে যুদ্ধ। আফগানিস্তানের দোস্ত্ মহম্মদ রাশিয়ার অনুকূলে অগ্রসর হলে অকল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প হন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদ পরাজিত হন এবং ইংরেজরা শাহ্ সুজাকে আফগানিস্থানের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন।

লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-১৮৪৪ খ্রীঃ) : লর্ড এলেনবরার শাসনকালে সিন্ধু বিজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি সিন্ধু অধিকার করার উদ্দেশ্যে নেপিয়ার নামে জনৈক উগ্র প্রকৃতির সেনাপতিকে সিন্ধুপ্রদেশের



আমীরদের বিরুদ্ধে পাঠান। মিয়ানি ও দাবোর যুদ্ধে নেপিয়ার আমীরদের পরাজিত করেন। আমীররা তাঁদের নিজস্ব অঞ্চল থেকে নির্বাসিত হয় এবং সিন্ধু ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম শিখ যুদ্ধ : শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ ছোট ছোট শিখ রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ শিখ শক্তিকে সংহত করতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু এই অঞ্চলের সর্দারগণ তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে রণজিৎ সিংহকে বাধা দেবার জন্য ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা

করেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করতে রণজিৎ সিংহের ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি ইংরেজ বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সন্ধি করেন। এটাই বিখ্যাত **অমৃতসরের সন্ধি** (১৮০৯ খ্রীঃ)।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ সেনাবাহিনী শিখরাজ্য ও ইংরেজ অধিকৃত ভূ-খণ্ডের মধ্যবর্তী শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের অমৃতসরের সন্ধি লঙ্ঘিত হয়। ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটাই প্রথম শিখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটে এবং পাঞ্জাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ঃ পাঞ্জাবে ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা সমরকুশলী শিখ জাতির মনঃপুত না হওয়ায় শিখরা পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। লর্ড ডালহৌসী তখন শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়, এবারও শিখগণ পরাজিত হলে পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) ঃ প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা ইংরেজদের উপর ভীষণ রাগান্বিত ছিল। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে লর্ড ডালহৌসী এক নৌ অভিযান রেঙ্গুনে প্রেরণ করেন এবং ব্রহ্মদেশের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ফলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮৫২ খ্রীঃ) ও ইংরেজ বাহিনী অল্পকালের মধ্যে রেঙ্গুন অধিকার করে। এই উপায়ে সমগ্র নিম্ন-ব্রহ্ম ইংরেজ শাসনাধীনের অন্তর্ভুক্ত হয়।



লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপনীতি ও সাম্রাজ্যবিস্তার ঃ লর্ড ডালহৌসী 'স্বত্ব-বিলোপনীতি'র প্রয়োগ করে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই নীতি অনুসারে ইংরেজ-আশ্রিত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করলে সে রাজ্য ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপুত্রক দেশীয় রাজ্যের কোন রাজা দত্তক গ্রহণ করে রাজ্য রক্ষা করতে পারবেন না।

ডালহৌসীর অনুসৃত নীতির ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ সরকারের কার্যক্রম ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানে ভারতবাসীদের ইন্ধন যোগায়।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●
১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল অনেকে তাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেন। অপরপক্ষে ভারতে স্বাধীনতা লাভের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান বলেও মনে করা হয়। ১৮৫৭খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামরিক—এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।


রাণী লক্ষ্মীবাঈ

রাজনৈতিক কারণ ঃ কোম্পানীর রাজ্য-গ্রাস নীতির ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হন। লর্ড ডালহৌসী দত্তক প্রথা নিষিদ্ধ করার ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজ্যহারা রাজাগণ ডালহৌসীর জোরজুলুমের প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, পেশওয়া বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা নেন।

সামাজিক কারণঃ ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয়দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ইংরেজরা অযথা তাদের সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করছে। খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের কার্যকলাপে ভারতীয়দের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্ম ধ্বংস করবে। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং ব্যাভিচার ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থান তারই পরিণতি।


নানাসাহেব

অর্থনৈতিক কারণঃ কোম্পানীর শাসন দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলে শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। জমির রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র চাষীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কুটির-শিল্প ধ্বংস হবার ফলে শিল্পী ও কারিগরগণ বেকার ও অন্নহীন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অবনতিও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায়।


তাঁতিয়া তোপী

ধর্মীয় কারণঃ অযোধ্যার নবাব রাজ্যচ্যুতি ও সিয়া সম্প্রদায় এবং মোগল সম্রাটের সম্ভ্রমহানির ফলে সুন্নীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফৈজাবাদের বিখ্যাত মৌলভী আহম্মদ উল্লাহ্ কোম্পানীকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

সামরিক কারণঃ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। ভারতীয় সিপাহীদের ইংরেজ সেনা অপেক্ষা কম বেতন ও নীচু মানের খাবার দেওয়া হ'ত।

তাদের পদোন্নতির কোন আশা ছিল না। উপরন্তু ইংরেজ উপর-ওয়ালারা সিপাহীদের সাথে অপমানজনক ব্যবহার করত। এসব কারণে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে।

অবশেষে বন্দুকের টোটাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এনফিল্ড রাইফেলের টোটাতে গোরু ও শূকরের চর্বি মেশানো হ'ত। সিপাহীদের ঐ টোটা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হ'ত। গোরুর চর্বি হিন্দুদের এবং শূকরের চর্বি মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। সিপাহী-গণ এগুলি ব্যবহার করতে অস্বীকার করলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৯ মার্চ কলিকাতার কাছে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক ব্রাহ্মণ সিপাহী প্রথম বিদ্রোহ করেন। পরে আম্বালা ও মীরাটের ছাউনিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ কেবলমাত্র একটি সামরিক অভ্যুত্থান অথবা একটি জাতীয় বিদ্রোহ এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্যার জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ একে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেন।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ সামরিক বা সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হলেও ক্রমে গণবিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ডক্টর রমেশ মজুমদারও এই অভ্যুত্থানকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুদ্ধরূপে আখ্যা দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের এক'শ বছর পূর্ণ হলে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বিশেষ সমালোচনা করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ সামরিক বা সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে আরম্ভ হলেও ক্রমে গণবিদ্রোহে পরিণত হয়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার বহু কারণ ছিল। এই বিদ্রোহ বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয়-ভাবে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে দেখা দিলেও ভারতের বহু অঞ্চল এই

বিদ্রোহের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। নর্মদা নদীর দক্ষিণে কোনও গোলযোগ ছিল না, সিন্ধু শান্ত ছিল, রাজপুতনা ইংরেজদের অনুগত ছিল এবং মধ্য ও পূর্ববঙ্গে বিদ্রোহ প্রসারলাভ ঘটেনি।

ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ, নানাসাহেব প্রভৃতি পরিকল্পনা নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীগণের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় কেন্দ্রীয় রণনীতি নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের অভাব তাদের ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণ। বিদ্রোহীদের কোনও সাধারণ পরিকল্পনা না থাকায় তাদের পৃথক পৃথক-ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়।

এছাড়া বিদ্রোহীগণের মধ্যে লক্ষ্যের স্থিরতাও ছিল না। কাশ্মীর, রামপুর রাজ্যগুলি ইংরেজদের পক্ষে থাকায় এবং সিন্ধিয়া ও রাজপুত রাজগণ নিরপেক্ষ থাকায় ইংরেজদের সুবিধা ঘটে। সফলতাও সহজলভ্য হয়।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা পত্রে ভারতবাসীদের সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতীয়গণের এই আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস আইন দ্বারা প্রতিযোগীগণের বয়স ২২ বছর ধার্য করা হয়। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে এই বয়ঃসীমা কমিয়ে ১৯ করা হয় যাতে ভারতীয়রা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে না পারে। ভারতীয় প্রার্থীগণকে সোজাসুজি নিষেধ করা সম্ভব না হওয়ায়

এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিভিল সার্ভিস অন্দোলনের কিছু পরেই লর্ড লিটনের অস্ত্র আইন এবং দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহুত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই অধিবেশনে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবী জানায়। ইংরেজ সরকার উচ্চ সরকারী পদগুলি থেকে ভারতীয়দের সতর্কতার সঙ্গে বঞ্চিত করে রাখেন। এতে শিক্ষিত ভারতীয়গণের হতাশা বেড়ে যায় এবং জাতীয় আন্দোলনে শিক্ষিত শ্রেণী যোগ দেন।


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে দাদাভাই নৌরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ ইংরেজ রাজত্বের শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্ সন্ধির দ্বারা ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হয়?
২. ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়?
৩. কার বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটে?
৪. ইংরেজের সঙ্গে কোন রাজার প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হয়?

৫. কত খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ?
৬. আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ কে লাভ করেন ?
৭. উত্তরাধিকারের যুদ্ধ উপলক্ষ করে ভারতে কোন্ বিদেশী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১. পলাশীর যুদ্ধের কারণ কি ?
২. প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ কি কারণে হয় ?
৩. সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল কেন ?
৪. ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কি বুঝ ? কোন্ কোন্ দেশ এই নীতির দ্বারা ইংরেজদের অধিকারে আসে ?
৫. প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ কি কারণে হয় ?
৬. রবার্ট ক্লাইভ কে ? দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধে তাঁর কি কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ?
৭. সিরাজদ্দৌলা কি কারণে ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন ? তার ফলে কোন্ যুদ্ধ ঘটে ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সিপাহী বিদ্রোহের কারণ কি ? এই বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি কিরূপ ?
২. পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বিষয়ে আলোচনা কর।
৩. লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও লর্ড ডালহৌসী সম্পর্কে যা জান লেখ।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পলাশীর যুদ্ধ হয় — খ্রীস্টাব্দের — শে জুন।
২. — বশ্যতামূলক মৈত্রীনীতি প্রবর্তন করেন।
৩. ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের — সন্ধি হয়।
৪. ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহকে — বলে।

খ. সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

১. ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়—
১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে □ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে □ ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে □
২. মহীশূরের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়—
১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে □ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে □ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে।

৮ | অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী : [যুক্তিবাদের যুগ]

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

কারণ : আমেরিকা মহাদেশের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানা দরকার। আমেরিকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে অনেক কারণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে তিনটি উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ঔপনিবেশকরা সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডের অধীন ছিল।



ইংলণ্ডের অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালে বিধিবদ্ধ 'নেভিগেশন অ্যাক্ট আইন অনুসারে উপনিবেশগুলিকে ইংলণ্ডের জাহাজে মাল আমদানি-রপ্তানি করতে হ'ত। এইসব বিধিনিষেধ হেতু উপনিবেশ গুলিতে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারলাভ করতে পারেনি এবং প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়।

শাসনক্ষেত্রে উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ড থেকে গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রেরিত হতেন। প্রায় প্রত্যেকটি উপনিবেশে একটি করে জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আইন পরিষদ ছিল। এই আইন-সভার সঙ্গে ইংরেজ শাসনকর্তার অধিকাংশ সময়ে গভীর মতানৈক্য দেখা দিত। রাজনৈতিক মত-বিরোধের জন্য ইংলণ্ড ও উপনিবেগুলির মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে ফরাসী অধিকৃত কানাডা থেকে উপনিবেশগুলি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকার উপকূল অঞ্চলে সৈন্য ও রণ-বহর মোতায়েন রাখা প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় আমেরিকা রক্ষার ব্যয়ভারের কতকাংশ ঔপনিবেশিকরা বহন করুক এই ছিল ইংরেজ সরকারের ইচ্ছা। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেণভিল 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট' নামে এক আইন প্রবর্তন করেন। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে অতঃপর আমেরিকায় দলিলপত্রের জন্য সরকারী স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করতে হবে। 'ডিক্লেটরি অ্যাক্ট' নামে আর একটি আইন দ্বারা এই কথা ইংলণ্ডে প্রচার করা হ'ল যে উপনিবেশগুলির উপর পার্লামেণ্ট আইনতঃ কর ধার্য করার সম্পূর্ণ অধিকারী। ইংলণ্ডের রাজস্ব-সচিব চার্লস টাউনসেণ্ড আমেরিকার চা, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের উপর নতুন শুল্ক ধার্য করলে অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বোষ্টন নগরে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। কয়েকজন আমেরিকান একদিন বোষ্টন বন্দরে একটি চা বোঝাই জাহাজে উঠে সমস্ত চা সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে লর্ড নর্থ বোষ্টন বন্দর বন্ধ করে দেন এবং ইংলণ্ড থেকে সৈন্যপ্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের এই দমননীতির প্রতিবাদে ঔপনিবেশিকরা ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরে এক মহাসভায় মিলিত হন এবং জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তারা প্রকাশ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ

গ্রহণ করে। আট বছরের বেশী উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলার পর ইংরেজরা পরাজিত হয়ে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয় (১৭৮৩ খ্রীঃ)। আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে মার্কিন জাতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৭৮৯খ্রীস্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল জর্জ ওয়াশিংটনকে স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল : ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি দ্বারা ইংরেজরা আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করলেও কানাডা, নোভোস্কোশিয়া ও নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড ইংরেজদের অধিকারে থাকে। জর্জ ওয়াশিংটন এই নতুন রাষ্ট্রের সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অল্প-কালের মধ্যেই পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসে।



জর্জ ওয়াশিংটন

এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক জগতে ইংলণ্ডের খ্যাতি ও গৌরব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

ঔপনিবেশিকের সাফল্য লাভের কারণ : আমেরিকানদের এই সাফল্যের পিছনে অবশ্য একাধিক কারণ ছিল। ইংরেজপক্ষে যুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছিল তারা ভাড়া করা সৈন্য, কিন্তু আমেরিকাবাসীরা সর্বস্ব পণ করে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নির্ভর করছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজরা আমেরিকার সামরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করতে পারেনি এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তাই তারা সাধ্যানুযায়ী সামরিক শক্তি নিয়োগ করেনি। তৃতীয়তঃ এই

যুদ্ধে ইংরেজদের প্রায় তিন হাজার মাইলের বেশী জলপথ অতিক্রম করে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী আমেরিকায় আমদানি করতে হয়েছিল। আমেরিকার পথঘাট সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান কম ছিল। চতুর্থতঃ ফ্রান্স ও স্পেন প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় ইংলণ্ডের আমেরিকা বিজয়ের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

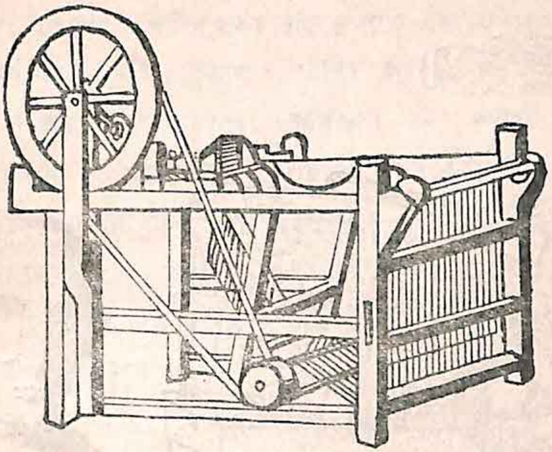
ইংলণ্ডের শিল্প-বিল্পব

শিল্প-বিপ্লবের অর্থ : আধুনিক ইউরোপের সভ্যতার মূলে আছে দুটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। একটি ফরাসী বিপ্লব, আর একটি শিল্প বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয় ইংলণ্ডে। তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে নানারকম বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল তা শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিত।

কৃষি-বিপ্লব : অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংলণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ রূপে পরিগণিত হ'ত। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের বাস ছিল গ্রামে। পল্লীজীবনই ছিল তাদের আদর্শ। তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় কৃষিকার্য ও পশুপালন। প্রথম জর্জের রাজত্বকালে মন্ত্রী টাউনসেণ্ডের চেষ্টায় একই জমিতে আগাছা রোপণ এবং বীজ শস্যের চাষ সম্ভবপর হয়। ফলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকেরা সারা বছর চাষবাস করার সুযোগ পায়। খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমির পরিবর্তে একই জায়গায় বিস্তীর্ণ জমি আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে কৃষি-কাজের নতুন বন্দোবস্ত করা হয়।

বিভিন্ন যন্ত্রের আবিস্কার : বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পে প্রথম যুগান্তর উপস্থিত হয়। ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'জন কে' নামক এক ব্যক্তি একপ্রকার দ্রুতগামী মাকু প্রচলন করলে এর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বস্ত্রের

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সূতা কাটার পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজন হয়। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে জেম্‌স হারগ্রীভস্ নামে একজন তন্তুবায় স্প্যানিং জেনি নামে একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে

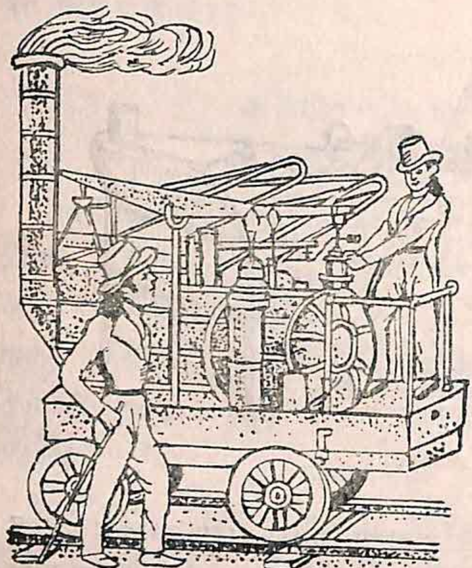


স্পীনিং জেনি

আর্করাইট জল-শক্তির সাহায্যে সূতা কাটার ব্যবস্থা করেন। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ক্রম্পটন্ 'স্পীনিং জেনি' ও 'ওয়াটার ফ্রেমের কতকগুলি অসুবিধা দূর করার জন্য স্পীনিং মিউল নামে এক উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিস্কার করেন। এই সব আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ সূতা কাটা ও বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হয়।

এই যুগে বাষ্পশক্তির ব্যবহার প্রণালী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জেমস্ ওয়াট ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে বাষ্পশক্তি চালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করায় জর্জ স্টিফেনসন সর্বপ্রথম বাষ্পশক্তি-চালিত রেল এঞ্জিন নির্মান করেন। এভাবে রেলগাড়ি, ছাপাখানা, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতিতে বাষ্পশক্তি ব্যবহার করবার সুযোগ আসে। বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার বহনের সুব্যবস্থা হয়। এইসব আবিষ্কারের ফলে শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। যানবাহনের সুবিধার জন্য ম্যাকাডেম পীচের রাস্তা নির্মাণ কৌশল আবিষ্কার করেন।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে লৌহশিল্পে খনিজ কয়লার ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশের লোহা ও কয়লার খনিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। খনিতে কাজ করার উপযোগী নিরাপদ বাতি আবিষ্কৃত হলে



প্রথম রেল ইঞ্জিন



জেমস্ ওয়াট

কয়লার খনির কাজ সহজ হয় ও অধিক কয়লা উত্তোলন সম্ভব হয়। লৌহ চুল্লী আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিরাট উন্নতি সাধিত হয়। লৌহশিল্পে উন্নতি হলে এবং উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা মজবুত ধরনের স্টিম-ইঞ্জিন প্রস্তুত হতে থাকে। ক্রমে ইংলণ্ডের কয়লাখনি অঞ্চলগুলি লৌহ ও ঢালাইয়ের কারখানায় ছেয়ে যায়। এইভাবে ম্যাঞ্চেস্টার, ব্রিস্টল, বাকিংহাম' সেফিল্ড, লিভারপুল শিল্পপ্রধান নগরগুলির উদ্ভব হয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলাফল: শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর জনসাধারণের সমাজ জীবন ও সভ্যতার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের ধনসম্পদ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। কারণ নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা

গড়ে উঠে। এ সকল কারখানায় অনেক অল্প সময়ে অধিক মাল উৎপন্ন হতে থাকে এবং এক ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডবাসীরা অন্য দেশে তাদের শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি আহরণ করে। ফলে ইংলণ্ডের উৎপাদিত দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং ইংলণ্ড ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়।

কৃষি বিস্তারের ফলে দেশের জমিগুলি ধনী সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকেরা কৃষিকাজ যথেষ্ট লাভজনক নয় বিবেচনা করে কৃষিকাজ ত্যাগ করে দলে দলে কলকারখানায় এসে মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করতে থাকে। তাছাড়া শহরের নানাস্থানে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় ও ক্রমশঃ কারিগরী শিল্পের প্রবল প্রতিযোগীতায় কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে পড়ে। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ে ও চরম আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়।

শিল্পবিপ্লবের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে সরকারী আইন-কানুন দ্বারা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করতে সচেষ্ট হন। ক্রমে শ্রমিক-উন্নয়নের জন্য আন্দোলন শুরু হয় ও ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটে। সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ দূর করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করাই সমাজ-তন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

ফরাসী বিপ্লব

প্রাক্-বিপ্লবী চিন্তাধারা ঃ বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ ভলতেয়ার রুশো ও মন্টেস্কু ঃ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসীর জনগণ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হয়ে এক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই-ই ইতিহাসে **'ফরাসী বিপ্লবী'** নামে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের

মত ফ্রান্সের বুঁর্বো রাজারা নিজেদের ইশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতেন এবং ইচ্ছামত প্রজার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। ভগবান-প্রদত্ত এই রাজ ক্ষমতার মতবাদ এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণীর অধিকার ভোগ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সব কিছুই সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

ফ্রান্সের বুঁর্বো রাজাদের শাসনকালে সমাজে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা দেয়, তার প্রতিকারসাধনে অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন চিন্তানায়ক উদ্‌গ্রীব হন। তাঁদের মধ্যে ভলতেয়ার ও রুশোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮খ্রীঃ) তাঁর লেখনীর সাহায্যে স্বৈরাচারী বুঁর্বো রাজাদের এবং অভিজাত ও যাজকবর্গের ভণ্ডামী ও উৎপীড়নের মুখোস খুলে দেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ন্যায় নীতি বিরোধী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ছিলেন ঐ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক।



ভলতেয়ার

নাটক, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁরই প্রায় সমসাময়িক রুশো (১৭১২-৭৮ খ্রীঃ)। রুশোই প্রথম প্রচার করলেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। রুশোর মূল বক্তব্য ছিল যে মানুষ স্বভাবত ভাল, সভ্যতাই তাকে নষ্ট করেছে। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হাতে রয়েছে। রাজা জনসাধারণের মতানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং অন্যথা হলে রাজাকে পদচ্যুত



রুশো

করার অধিকার জনসাধারণের আছে। সামাজিক চুক্তি নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন। রুশোর লেখা পড়ে দেশময় অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের ভাব ছড়িয়ে পড়ে। দি পার্সিয়ান লেটার্স নামক গ্রন্থে আর একজন চিন্তানায়ক মণ্টেস্কু পরিহাসচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী সমাজের দোষ ত্রুটির উপর কটাক্ষপাত করেন। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ দি স্পিরিট অব্ দি লজ্।


মন্টেস্কু

উপরোক্ত চিন্তানায়করা তাঁদের রচনা দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পথ কেবলমাত্র যে সহজ করে দিয়েছিলেন তা নয়, সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারেও তাঁদের রচনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ: কোন একটি বিশেষ কারণে ফরাসী বিপ্লব সৃষ্টি হয়নি, বহুদিনের পুঞ্জীভূত নানা অভিযোগের ফলে ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি।

চতুর্দশ লুই সগৌরবে রাজত্ব করলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাজতন্ত্র তার প্রকৃত শক্তি হারিয়ে ফেলে। চতুর্দশ লুই-এর পরবর্তী রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের ক্ষমতা ও অধিকার পুনরুদ্ধার করে এবং রাজতন্ত্রকে আপন স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করে। তখন বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। বিচার ছিল ব্যয় সাপেক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। রাজসভার যে কোন সদস্য ব্যক্তিগত শত্রু দমন করার উদ্দেশ্যে লেত্রি দি ক্যাসেট নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা রাজাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিত। এভাবে শাসনব্যবস্থার চরম দুর্বলতা বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। রাজতন্ত্রের দুর্বলতা এবং শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষমতা ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ হিসাবেও বিবেচ্য।

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত ফরাসী নৌবহরের পরাজয়ে ফরাসী রাজতন্ত্রের সামাজিক মর্যাদা বিনাশ হয়। এভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ফরাসী জাতির নিকট ফরাসী রাজতন্ত্র হেয় প্রতিপন্ন হয়।

ফ্রান্সের জনসমাজ ফরাসী বিপ্লবের ঠিক আগে প্রথম সম্প্রদায় বা যাজক শ্রেণীতে, অভিজাত সম্প্রদায় বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং অধিকার-হীন শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক, শ্রমশিল্পী ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায় প্রভূত জমিজমা ও ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও রাজাকে কোন খাজনা দিত না। রাজস্ব দিত তৃতীয় সম্প্রদায়। কৃষকগণের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের আয়ের বেশীর ভাগ চলে যেত রাজা ও বড়লোকদের কাছে। শ্রমজীবি, শিল্পী ও দিনমজুরদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তারা বেকার অবস্থায় খাদ্যাভাবে পথ ঘাটে ঘুরে বেড়াত। কাজেই দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একটি বড় রকমের বিপ্লবের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লবের গতি ঃ নানা কারণে ফরাসী বিপ্লব যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তখন অর্থাভাব হেতু ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই বাধ্য হয়ে জাতীয় সভা—স্টেটস্ জেনারেল-এর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করা স্থির করেন। ফরাসী জাতির যাবতীয় অভিযোগ দূর করতে বদ্ধপরিকর হলে স্বভাবতই বিপ্লব শুরু হয়। স্টেটস্ জেনারেলের আহ্বান ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ বলা যেতে পারে। রাজা ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে স্টেটস্ জেনারেল মহাসভা আহ্বান করলে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এককভাবে নিজেদের ফ্রান্সের জাতীয় সভা ন্যাশনাল অ্যাসেম্‌ব্লী বলে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকে প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হয়।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মে মিরাবো নামে এক তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির দৃঢ়তায় রাজা ষোড়শ লুই তিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একত্রে একই সভায় বসার নির্দেশ দেন এবং সদস্যদের অনমনীয় আচরণে ভীত হয়ে রাজা জাতীয় মহাসমিতির শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার স্বীকার করেন (২৭শে জুন ১৭৮৯ খ্রীঃ)।



মিরাবো

শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সময় সাপেক্ষ কিন্তু প্যারিসের এক উন্মত্ত জনতা আর অপেক্ষা করতে না পেরে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বনিসহ প্যারিসের কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে। এই দুর্গ ছিল ফরাসী স্বৈরতন্ত্রের চরম অত্যাচারের প্রতীক। দুর্গ অধিকার করে সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এভাবে প্রকাশ্য বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়। আজও ১৪ই জুলাই তারিখটি ফ্রান্সে 'জাতীয় দিবস' হিসাবে পালিত হয়।



রাণী মেরিয়া আণ্টোনিয়েট

পল্লী-অঞ্চলে নিপীড়িত কৃষকসমাজও বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেয়। কৃষক আন্দোলনের সংবাদ ভার্সাই নগরীতে জাতীয় পরিষদের নিকট পৌছলে সেখানেও তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিকে দেশে খাদ্যাভাব গুরুতর আকার ধারণ করে। প্যারিসে অনশনক্লিষ্ট জনতা দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। একদল বুভুক্ষু নারী শোভাযাত্রা করে ভার্সাই নগরের দিকে যাত্রা করে। এই জনতার হাতে এক প্রকার

বন্দী অবস্থায়ই রাজা ও রাণী মেরিয়া আন্টোনিয়েট প্যারিস শহরে আসতে বাধ্য হন। ভার্সাই থেকে রাজ পরিবারের প্যারিসে আসার



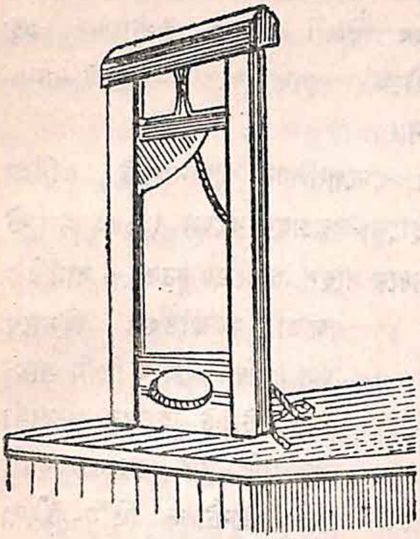
বুভুক্ষু নারীর শোভাযাত্রা

ফলে জাতীয় সভাকেও প্যারিসে অধিবেশন বসাতে হয়। স্বভাবতই এইসভা ফরাসী সংবিধান সভায় পরিণত হয়।

সংবিধান সভা রাজার ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং রাজপরিবারে ব্যয় কী হবে তার একটি তালিকা তৈরী করে। জাতীয় পরিষদ এক নতুন শাসনতন্ত্রও রচনা করে। এতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজার রাজ্যশাসনের স্বেচ্ছাচার ক্ষমতা লোপ পায়। ষোড়শ লুই-এর কিন্তু এই নতুন শাসনব্যবস্থা পছন্দ হয়নি। বিদেশীদের সাহায্যে পুনরায় ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সপরিবারে দেশ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু মাঝপথে ধরা পড়ে যান। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে গঠিত ন্যাশনাল কনভেন্শন্ বা জাতীয় বিপ্লবী প্রতিনিধি-সভা ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দেয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী হতভাগ্য ষোড়শ লুই প্রাণ হারান।

রাজার প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সকল রাজতান্ত্রিক দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যায়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ বিপ্লবী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থা চরমপন্থী বিপ্লবী জেকোবিনদের হাতে চলে যায়। তাদের নেতা রোবস্‌পিয়ার। এরূপ পরিস্থিতিতে জাতীয় সভা এক

অতিশয় কঠিন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। জননিরাপত্তা সমিতি ও বিপ্লবী বিচারালয় নামে দুটি সংস্থার উপর এই কঠোর সন্ত্রাসবাদী শাসনকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। এইভাবে ফ্রান্সে যে শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয় তা ভয়াবহ শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। 'গিলোটিন' যন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবী বিরোধী সন্দেহে বহু মানুষের শিরশ্ছেদ করা হয়। ষোড়শ লুই-এর রাণী মেরিয়া আন্টোনিয়েট্‌কে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। এরপরে ফ্রান্সে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। ক্রমে জেকো-



গিলোটিন

বিনরা এদের নিজেদের মধ্যে কলহ ও দলাদলি শুরু করে। তখন রোবস্‌পিয়ারের যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁরাও প্রাণ হারান। রোবস্‌পিয়ার নিজে গিলোটিনে প্রাণ হারান এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাস রাজত্বের অবসান হয়।



রোবস্‌পিয়ার

বিদেশী শক্তিসঙ্ঘের মোকাবিলা করতে গিয়ে ফ্রান্স বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ-নীতি চালু করে এবং সর্বত্র শক্তি সঙ্ঘের সৈন্যদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট টুঁলো নামক ফরাসী বন্দরে বৃটিশ নৌবহরকে পরাজিত করে দেশের এক জাতীয় বিপদ দূর করেন। এই সময়ে নেপোলিয়নের

ক্রম-অভ্যুত্থান শুরু। তখন ফ্রান্সে এক নূতন সংবিধান অনুসারে ডাইরেক্টরী নামে পাঁচজন নেতার এক সংস্থার হাতে দেশের শাসনভার দেওয়া হয়। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ডাইরেক্টরী শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে কনসালেট নামক এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্সিকা দ্বীপের এ্যাজাক্‌চো নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (১৫ই আগস্ট ১৭৬৯ খ্রীঃ)। নেপোলিয়নের হৃদয়ে সাহস, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সামরিক দক্ষতা সহজাতগুণ হিসাবে ছিল। শিক্ষা শেষে তিনি সাব-লেফ্‌টেন্যাণ্ট হিসাবে ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি টুঁলো বন্দর থেকে ইংরেজ সেনা-বাহিনীকে বিতাড়িত করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা আনেন। এই কাজের পুরস্কার হিসাবে তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। ডাইরেক্টরীর অধীনে কর্মরত অবস্থায় নেপোলিয়ন ইটালীর সার্ডিনিয়া দ্বীপের অধিবাসীদের পরাজিত করেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিসঙ্ঘ ভেঙ্গে দেন। নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং কনসালেট নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদ লাভ করার পর ফরাসী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতকগুলি সংস্কারের প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়নের সবচেয়ে বিখ্যাত সংস্কার হ'ল তাঁর আইনবিধি। ফ্রান্সের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের প্রচলিত



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি এই সাধারণ আইনবিধি প্রণয়ন করেন।

প্রথম কন্সালরূপে নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ বিনাশ করা। ১৭৯৯ খ্রীঃ থেকে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘকে পরাজিত করেন এবং বহুদেশ অধিকার করে ফরাসী-সাম্রাজ্য গঠন করেন। ইটালী, জার্মানি, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া তাঁর সঙ্গে মিত্রতার চুক্তি সম্পাদন করে। ১৮০২ খ্রীঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এমিয়েন্সের শান্তি-চুক্তি স্থাপিত হয়। এইভাবে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘকে নাশ করে নেপোলিয়ন বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁকে যাবজ্জীবন কন্সাল নিযুক্ত করা হয়। এর দু'বছর পর তিনি গণভোটের মাধ্যমে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন।

সম্রাট নেপোলিয়ন ও ইউরোপে বিদ্রোহ: ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সম্রাটপদ লাভ কনসালেট আমলের স্বৈরাচারী শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। নেপোলিয়ন যে কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে সম্রাটপদ লাভ করেন তা নয়, জনসাধারণের বিপুল ভোটাধিক্যে তা সমর্থিত হয়।

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে এমিয়েন্সের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে শান্তি স্থাপিত হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ নৌ-বহর ফরাসী বাণিজ্যপোত আক্রমণ করে এবং ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ট্রাফালগার নৌ-যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি নেলসন্ নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর কন্টিনেন্ট্যাল সিস্টেম নামে সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা করেন এবং এই অবরোধই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর কিছুদিন পর নেপোলিয়ন প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করেন। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাশিয়াকে নিজ পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। রাশিয়ার সঙ্গে টিলজিটের সন্ধিও সাক্ষর করেন। এই

সন্ধির শর্ত অনুসারে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সামুদ্রিক অবরোধ অভিযান করতে স্বীকৃত হন।

কন্টিনেন্ট্যাল সিস্টেম কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন পোর্তুগাল ও স্পেন অধিকার করেন। পোর্তুগালের পর তিনি স্পেনও দখল করেন। এরপর স্পেনের সিংহাসনে সহোদর জোসেফকে বসান। এতে স্পেনবাসীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং স্পেনীয় দেশ-প্রেমিকেরা গেরিলাযুদ্ধ শুরু করে। এই সুযোগে ইংরেজরা স্পেনবাসীদের সহায়তা করতে থাকে।

নেপোলিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মস্কো অভিযান করেন। রুশ সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। নিদারুণ শীত, অনাহার এবং গেরিলাবাহিনী ও বন্যজন্তুর আক্রমণে নেপোলিয়নের হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা সমস্ত ইউরোপে এক আনন্দের সঞ্চার করে। চতুর্দিকে আক্রান্ত হয়ে লিপ্‌জিগ-এর যুদ্ধে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরাজিত হন। এ যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করে এল্‌বা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ১লা মার্চ তিনি আবার ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন। মাত্র একশ' দিন রাজত্ব করার পর ১৮ই জুন ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর হাতে পরাজিত হন। নেপোলিয়ন এবার সেন্ট্‌ হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল ঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী অবিস্মরণীয় ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব ফরাসী বিপ্লব হতে উদ্ভূত হয়েছে। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে স্বাধীনতা,

সাম্য, মৈত্রীর আদর্শ ফরাসী জাতির মধ্যে স্থায়ী আসন যেমন লাভ করে তেমনি এই আদর্শের বীজ ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে। ফ্রান্স এবং সমস্ত ইউরোপে ভোটাধিকার, সভ্য সমিতির অধিকার এবং সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী, বিপ্লবের পর ফরাসী শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি ক্রমে গৃহীত হয়।

ইউরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের আইন-বিধির মূলনীতিগুলি এবং উন্নতধরণের শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ নীতি ছিল বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই সকল প্রভাবের প্রকৃত ফলাফল পরবর্তীকালে ইটালী ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য, বলকান অঞ্চলের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন দেশে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আইনের চোখে সমাজের সকল ব্যক্তির সমতা, ধর্ম সহিষ্ণুতা নীতিও ফরাসী বিপ্লব থেকেই ইউরোপে বিস্তার লাভ করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে অভিজাত এবং যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত হয়। সামন্তপ্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং ফরাসী দেশের ভূসম্পত্তির পুনর্বণ্টনের ফলে এক স্বাধীন কৃষক সমাজের সৃষ্টি হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. নেভিগেশন অ্যাক্ট কার শাসনকালে বিধিবদ্ধ হয় ?

২. ভার্সাই সন্ধি কার মধ্যে হয়েছিল ?

৩. স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ?

৪. শিল্প বিপ্লব কোথায় হয়েছিল ?

৫. দ্রুতগামী মাকু কে প্রচলন করেন ?

৬. লৌহ শিল্পে খনিজ কয়লার ব্যবহার পদ্ধতি কবে শুরু হয় ?

৭. বাষ্প চালিত রেল এঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন ?

৮. ষোড়শ লুই কত খ্রীস্টাব্দে প্রাণ হারান ?

৯. গিলোটিনে কাদের শিরশ্ছেদ করা হত ?

১০. ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে কে নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছিলেন ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝ ?

২. কি কারণে প্যারিসের জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করেছিল ? এই দুর্গ পতনের ফলে ফ্রান্সে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?

৩. শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৪. কেন ইংলণ্ডের রাজ্য সরকারের সঙ্গে উপনিবেশিকদের বিরোধ ঘটে ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কি জান লিখ।

২. শিল্প বিল্পব বলতে কি বোঝ ? শিল্প বিপ্লব কোথায় হয়েছিল ? এর ফলাফল আলোচনা কর।

৩. ফরাসী বিপ্লবের কারণ, গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা কর।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক কারণগুলির পাশে ✓ চিহ্ন এবং অন্যান্যগুলির পাশে × চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রবর্তন। (খ) রেড্ ইণ্ডিয়ানদের আমেরিকা হতে নির্বাসন। (গ) টাউনসেণ্ড কর্তৃক চা, কাগজ, কাঁচ প্রভৃতির উপর আমদানি শুল্ক ধার্যকরণ (ঘ) ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি। (ঙ) ইংলণ্ডের সঙ্গে উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক বিরোধ। (চ) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নেভিগেশন্ অ্যাক্ট প্রবর্তন। (ছ) ঔপনিবেশিকদের দাস রূপে বিক্রয়। (জ) ম্যাসাচুসেটাস-এর স্বায়ত্তশাসন অধিকার হরণ।

২. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) দি স্পিরিট অব্ দি লজ, গ্রন্থটি — কর্তৃক রচিত।

(খ) পিচের রাস্তা নির্মাণ কৌশল আবিষ্কার করেন —।

৯ | ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইউরোপের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভিয়েনা বৈঠক

ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে মিলিত হন।

ভিয়েনা বৈঠকে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ নেপোলিয়নের পর ইউরোপের পুনর্গঠন বিষয়ে তিনটি মূল নীতি অনুসরণ করেছিলেন। (১) ক্ষতিপূরণ (২) দীর্ঘাধিকার স্বত্ব অর্থাৎ প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রবর্তন (৩) ভবিষ্যতে যাতে কোন একটি রাষ্ট্র ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসারে ভিয়েনা বৈঠকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অগ্রণী ছিল রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া। এদের প্রত্যেককে ভূখণ্ড দিয়ে পুরস্কৃত করে এদের রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। বিজয়ী শক্তিগুলি পুরস্কার লাভ করেই ক্ষান্ত হয়নি। পরাজিত ফ্রান্স এবং তার সহকারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধেও তারা শাস্তিমূলক একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইংলণ্ডে অরেঞ্জ বংশীয় শাসক ও সার্ডিনিয়াতে স্যাভয় বংশীয় শাসকদের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শক্তিসাম্যের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাতে ইউরোপের শান্তি ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের পর যেসব অঞ্চল দখল করে ফ্রান্স রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেছিল সেগুলি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে প্রাক-বিপ্লব যুগের সীমানার মধ্যে তাকে গণ্ডীবদ্ধ করা হয়।

ভিয়েনা বৈঠকের প্রতিনিধিরা মুখে বহু উচ্চ আদর্শের কথা বললেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়া পন্থী। পরাজিত

শত্রুরাজ্য যথাসম্ভব গ্রাস করে নিজ নিজ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে ভালভাবে রক্ষা পায় সেইরূপ কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তাঁরা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা জনমত অগ্রাহ্য করে হল্যাণ্ডকে বেলজিয়ামের সঙ্গে এবং নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁরা ইটালীর জাতীয়তাবোধ অগ্রাহ্য করে অষ্ট্রিয়াকে ইটালীতে প্রাধান্য দেন এবং জার্মানিতে একটি দুর্বল রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করেন।

দীর্ঘাধিকার স্বত্বের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের অনাস্থাভাজনে যেসব রাজবংশ বিপ্লবী যুগে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে পুনর্বহাল করেন। এইভাবে ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কেরা জাগ্রত জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন। ফরাসী বিপ্লবজাত ভাবধারা অস্বীকার করে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁরা প্রবর্তন করতে উদ্যত হন তা যে স্থায়ীত্বলাভ করতে পারবে না, এই সহজ সরল সত্যটি তাঁরা বুঝতে পারলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাগ্রত জনমতের কাছে তাঁরা নতি স্বীকারে বাধ্য হন। ভিয়েনা বৈঠকের প্রতিক্রিয়াপন্থী সিদ্ধান্তগুলি একে একে পরিবর্তিত হয়—জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের নীতি জয়যুক্ত হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

চতুঃশক্তি সম্মেলনে গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

ভিয়েনা কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনায়কগণ ফরাসী সামরিক শক্তি এবং ফরাসী ভাবধারা থেকে ইউরোপকে রক্ষার জন্য একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রসংস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হবে ভিয়েনা বৈঠকে গৃহীত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাগুলি মেনে চলছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং ইউরোপের শান্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে

সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দায়িত্ব পালনের জন্য ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে চারটি শক্তির সম্মেলনের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় তা **চতুঃশক্তি সম্মেলন** নামে পরিচিত।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি ঠিক করলেন যে তাঁরা প্রয়োজন অনুসারে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক বৈঠকে মিলিত হয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের নিজেদের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ও আলোচনা করবেন। চতুঃশক্তি সম্মেলনের শর্ত অনুসারে সদস্যরা চারটি প্রধান বৈঠকে মাঝে মাঝে মিলিত হন। এই চারটি বৈঠক—

(১) আই-লা-স্যাপেলের বৈঠক ১৮১৮ খ্রীঃ (২) ট্রপ্পৌ-এর বৈঠক—১৮২০ খ্রীঃ (৩) লাইবেকের বৈঠক—১৮২১ খ্রীঃ (৪) ভেরোনার বৈঠক—১৮২২ খ্রীঃ।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে সাময়িকভাবে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর তাঁদের ঐক্যবন্ধন শিথিল হয় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও স্বার্থগত বিরোধ প্রবলভাবে দেখা দেয়। ভিয়েনা কংগ্রেসের শর্তাবলী অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সংহতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেসে যে সব শর্তাবলী গৃহীত হয় সেগুলি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্খার বিরোধী। সুতরাং যে আদর্শের ভিত্তি করে ইউরোপীয় সংহতি-রচিত হয়েছিল তা ছিল যুগধর্ম বিরোধী। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইউরোপীয় সংহতির অপমৃত্যু ঘটে।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

মেটারনিক ও তাঁর পদ্ধতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের রাজনীতিতে যেসব নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় হিসাবে এটুকুই

যথেষ্ট যে, ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে মেটারনিকের একাধিপত্য ও প্রাধান্যের জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের অন্তবর্তীকাল মেটারনিক যুগ বলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক কূটনীতিবিদদের মধ্যে মেটারনিক অন্যতম। জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে মেটারনিক ছিলেন সিদ্ধহস্ত।



মেটারনিক

মেটারনিক ফরাসী বিপ্লব-পূর্ব-যুগের ভাবধারার মূর্ত প্রতীক। ফরাসী বিপ্লব ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মেটারনিক বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপের জনসাধারণের কাম্য স্বাধীনতা নয় শান্তি। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রচারিত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ তিনি প্রতিহত করেছিলেন। তিনি বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতির প্রভাবে ভিয়েনা বৈঠকে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি মেটারনিকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সমন্বিত বিশাল অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মেটারনিক। জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব ছিল না। তাই জাতীয়তাবোধ ও গণতন্ত্রের দাবীকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে তিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হন। এজন্য তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ বজায় রেখে ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখা।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

ইটালী ও জার্মানির ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাস

ফরাসী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীরা ইউরোপের সর্বত্র স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল। প্রতিটি জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে এই আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের সময়েই প্রচারিত হয়। "এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—ফরাসী কিপ্লবের এই আদর্শের প্রভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীতে ও জার্মানিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠিত হয়। বহুকাল ধরে ইটালী ও জার্মানির কোনরকম রাজনৈতিক একতা ছিল না; ইটালীর স্বাধীনতাও ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই এই দু'টি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

ইটালীর ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাস ঃ ইটালীর দুর্বলতা ও একতার অভাবের সুযোগ নিয়ে অষ্ট্রিয়া ইটালীর উত্তরাঞ্চল দখল করে। দক্ষিণ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন একজন স্পেনীয় রাজা এবং মধ্যাঞ্চল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটা ছিল পোপের অধীন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত বিচ্ছিন্ন ইটালী নিজের অধীনে আনেন। এইভাবে পূর্বের মত পরাধীন থাকলেও নেপোলিয়নের অধীনে ইটালী কিছুটা রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করে। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইটালীতে জাতীয় আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।


ম্যাৎসিনি

এই সময় ইটালীয়দের মধ্যে একজন নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি ম্যাৎসিনি। তাঁর লেখা এক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ম্যাৎসিনি ইটালীবাসীদের পূর্ব গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেন।

তাঁর আকাঙ্খা ছিল ইটালীতে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। মাতৃভূমির স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নবীন ইটালী নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। ফলস্বরূপ ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইটালীতে এক ব্যাপক বিপ্লব দেখা দেয়। উত্তর ইটালীর পিড্‌মণ্টের রাজা এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু



গ্যারিবল্ডি

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরাজিত হন। এর পর থেকেই পিড্‌মণ্ট ইটালীর জাতীয়তাবাদের আশার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৪৯ খ্রীঃ পিড্‌মণ্টের রাজা হলেন ভিক্টর ইম্যানুয়েল। তাঁর দূরদর্শিতা সাহস ও রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য ইটালীর জাতীয় আন্দোলন সাফল্যলাভ করে। তাঁর এক বিচক্ষণ মন্ত্রী তাঁকে গভীর প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, তাঁর নাম কাভুর। যেসব দেশপ্রেমিক নেতার উৎসাহ ও অদম্য চেষ্টার ফলে ইটালীর জাতীয়তাবাদ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুর। জাতীয় আন্দোলনে ম্যাৎসিনির দান ছিল আদর্শবাদীর প্রেরণা, আর গ্যারিবল্ডির দান শক্তি ও সাহস। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে কাভুরের দানই সবচেয়ে বড়। প্রধানতঃ তাঁর দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ফলেই ইটালীর জাতীয় আন্দোলন সফল হয়।

কাউণ্ট কাভুর ঃ ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের সাফল্য এনেছিলেন কাভুর। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে কাভুর পিডমণ্ট রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ম্যাৎসিনির ন্যায় কাভুরেরও উদ্দেশ্য ছিল ইটালীর স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় ঐক্য স্থাপন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, প্রত্যুৎপন্নমতি, কুটকৌশলী রাষ্ট্র পরিচালক। তিনি একথা বুঝতে

পেরেছিলেন যে বৈদেশিক শক্তির সামরিক সাহায্য না পেলে ক্ষুদ্র পিড্‌মণ্ট রাজ্যের পক্ষে শক্তিশালী অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করা অসম্ভব।



ইটালীর ঐক্যসাধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর পক্ষে যোগদান করেন। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সদস্য হিসাবে স্থান পান। সেখানে তিনি ইটালীর ঐক্য সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কাভুর ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি গোপন চুক্তি করেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও পিড্মণ্টের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এক বিপুল বাহিনী নিয়ে ইটালীতে এসে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। সন্ধির শর্তানুসারে পিড্মণ্ট অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে লোম্বার্ডি প্রদেশ লাভ করে। ইটালীর ঐক্য সাধনের এটাই প্রথম সোপান।

এর পর মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলি পার্মা, মোডেনা, টাস্কেনি প্রভৃতি পিড্মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাভুরের প্রচেষ্টায় মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলি পিড্মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে প্রায় সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইটালী একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তরে অষ্ট্রীয়ার শাসনাধীন ভেনিশিয়া প্রদেশ ও মধ্য ইটালীতে পোপের রাজ্য বাদে।



কাউণ্ট কাভুর

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ইটালীতে সিসিলী ও নেপল্সে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দিলে কাভুরের গোপন পরামর্শে গ্যারিবল্ডি এক হাজার সৈন্য নিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য সিসিলিতে যান। গ্যারিবল্ডি সিসিলী অধিকার করে নেপল্স আক্রমণ করেন ও সহজেই জয়লাভ করেন।

এইভাবে কেবলমাত্র রোমনগরী ও ভেনিস ভিন্ন সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ হয়। কাউণ্ট কাভুর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার সাহায্যে ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রোমনগরী ও ভেনিস ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হবার পূর্বেই কাভুরের মৃত্যু হয়।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বনের ফলে ইটালী ভেনিস এবং ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে

প্রাশিয়ায় সঙ্গে যোগদান করার ফলে রোমনগরী লাভ করলে ইটালীর ঐক্য স্থাপিত হয়।

জার্মানির ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাস ঃ ইটালীর ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মানরাও ঐক্যবদ্ধ হতে সচেষ্ট হন। ইটালীর ঐক্য যেমন পিড্‌মণ্ট ও সার্ডিনিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে, তেমনি উত্তর জার্মানির প্রাশিয়া নামক রাজ্যের চেষ্টায় জার্মান-ঐক্য সাধিত হয়।

বর্তমান যুগের আরম্ভে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এই রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা ছিল তিনশ'-রও বেশী। এর মধ্যে প্রাশিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ক্রমশঃ প্রাশিয়া জার্মানিতে অষ্ট্রিয়ার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। নেপোলিয়ন যখন জার্মানিতে অভিযান করেন তখন জার্মানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। নেপোলিয়ন জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করে উনচল্লিশটি রাজ্য গঠন করেন। নেপোলিয়নের অভিযানের ফলেই জার্মানিতে ঐক্যতার সূত্রপাত হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানিকে বিপ্লবের পূর্বাবস্থায় অনেকটা ফিরিয়ে আনা হয়। ভিয়েনা বৈঠকে জার্মানির জন্য যে শাসন ব্যবস্থা তৈরী হয় তাতে সর্বপ্রধান স্থান অষ্ট্রিয়াকে দেওয়া হয় এবং তার পরই প্রাশিয়ার স্থান। আসলে ভিয়েনা বৈঠকে জার্মানির কর্তৃত্ব অষ্ট্রিয়ার হাতেই থাকে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই-বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু দমননীতির দ্বারা অষ্ট্রিয়া এই আন্দোলন দমন করে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে বিপ্লব শুরু হলে, জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রাশিয়া-রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজের দুর্বলতার জন্য এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া শক্তিসঞ্চয় করে জার্মানির এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়।

জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেন অটো ভন বিসমার্ক (১৮১৮-৯৮ খ্রীঃ)। বিসমার্ক রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের পুত্র এবং প্রথম উইলিয়ামের প্রধানমন্ত্রী। জার্মানির এক অভিজাত বংশে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রক্ষণশীল বিসমার্ক ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। জার্মানির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। জার্মানিতে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব লোপ করে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে এবং প্রাশিয়ার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাহায্যে জার্মান জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব।


অটো ভন বিসমার্ক

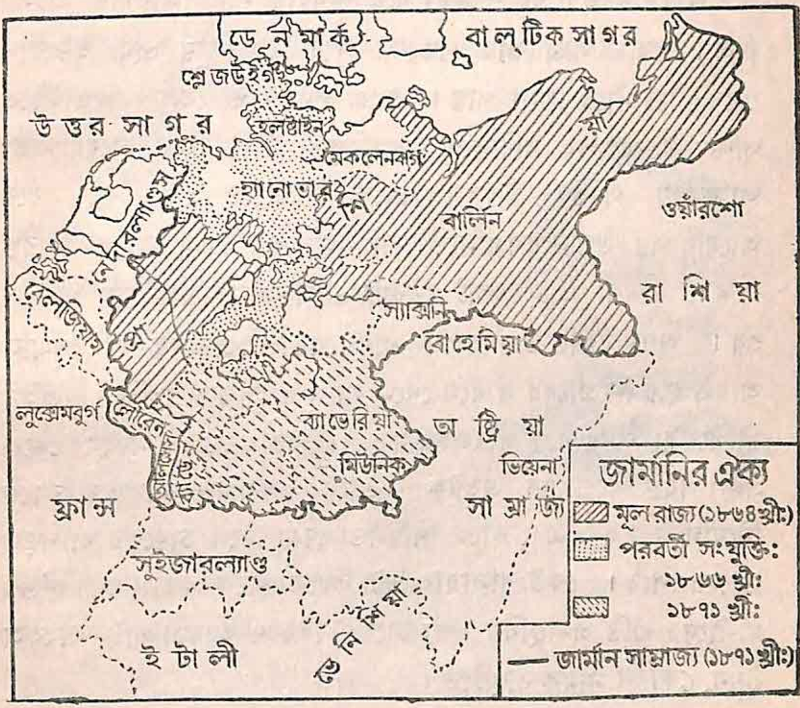
১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হলেন। তিনি প্রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনের চেষ্টা করলে পার্লামেণ্টের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বিসমার্ক প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাজার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বক্তৃতা বা ভোটাধিক্যে দেশীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; প্রয়োজন রক্তপাত ও অস্ত্র প্রয়োগ নীতির। অহিংস নয়, সহিংস আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র পথ।


প্রথম উইলিয়াম

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে বিসমার্ক শ্লেজউইগ ও হলস্টাইন নামে দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদ শুরু করেন। ফলে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার মধ্যে সাত সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে সুশিক্ষিত প্রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটে। ফলে সমস্ত উত্তর জার্মানি থেকে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হয় এবং সেখানে প্রাশিয়ার প্রভাব প্রবল হয়। দক্ষিণ জার্মানির কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্র নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর-জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

এই ঘটনার চার বছর পর স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে



ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হন। পরাজিত ফ্রান্স বিজয়ী জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং রাইন তীরবর্তী আলসেস ও লোরেন প্রদেশ দুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-জার্মানির রাষ্ট্রগুলি প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগদান করায় জার্মানির ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। জয়লাভের পর জার্মান রাষ্ট্রগুলির অনুরোধে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম সমগ্র

জার্মানির সম্রাট রূপে ঘোষিত হন। প্যারিসের উপকণ্ঠে ফরাসী সম্রাটদের ভার্সাই প্রাসাদে তাঁর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিসমার্কের কূটনীতি ও প্রাশিয়ার সৈন্যদের শক্তির বলে জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ হয়।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

আমেরিকার গৃহ যুদ্ধ

ক্রীতদাস-প্রথা বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রচলন ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই নিষ্ঠুর প্রথা ইউরোপ থেকে ধীরে ধীরে লোপ পায়। পরে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের বণিকেরা, নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় চাষের জন্য, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে নিগ্রোদের জোর করে ধরে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে দাস হিসাবে বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ এটি একটি বিরাট ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। আমেরিকার উপনিবেশে এসে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে নিগ্রোদের জীবনে নেমে আসে এক চরম দুর্গতি। জমির মালিকেরা এদের সঙ্গে জীবজন্তুর মত ব্যবহার করত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিগ্রোদের এতটুকু বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে কাজে নিয়োগ করা হ'ত এবং কাজে শিথিলতা দেখা দিলে চাবুকের ঘা পড়ত তাদের পিঠে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করা হ'ত। দাসীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ আমরা পাই আংকল টমস্ কেবিন নামক গ্রন্থটিতে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দাসত্ব-প্রথা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে একটি বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ছিল শিল্প-প্রধান, শিল্পের কাজে নিগ্রো ক্রীত-দাসের চেয়ে স্বাধীন ইউরোপীয় শ্রমিক অনেক ভাল ছিল। এজন্য উত্তরাঞ্চলে কোন ক্রীতদাসের প্রয়োজন ছিল না। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ছিল উষ্ণ ও কৃষি-প্রধান। সেখানে আখ, তামাক ও তুলোর চাষ হ'ত।

এই ধরনের কাজে নিগ্রোরা অত্যধিক পারদর্শী ছিল এবং ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করালে খরচও খুব কম হ'ত। সেজন্য দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী ছিল। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ক্রমশঃ বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্ব-প্রথা রহিত করার জন্য জনমত প্রবল হয়ে উঠে এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব-প্রথা বজায় রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

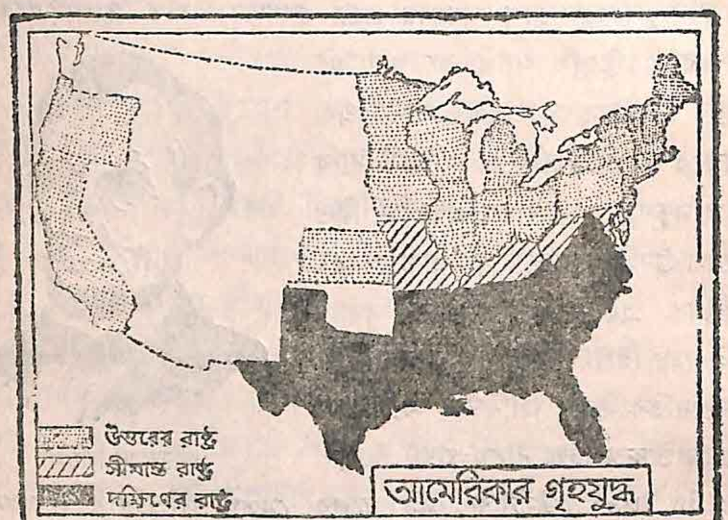
দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে, যখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বগণ্ডী অতিক্রম করে পশ্চিম মহাসাগরের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকে। তারা নতুন নতুন দেশ অধিকার করে সেখানে বসতি স্থাপন করে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দাবি করে যে এই নতুন অধিকৃত অঞ্চলে দাসত্ব-প্রথা থাকবে না, কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি দাবি করে নতুন অঞ্চলে দাসত্ব-প্রথা প্রসারিত হবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময় রিপাবলিকান নামে যে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করা। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে এই দলের নেতা আব্রাহাম লিংকন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে কেণ্টাকী নামক রাজ্যে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। ন্যায়পরায়ণ, দয়া-দাক্ষিণ্য, সরলতা, সত্যবাদীতা ও দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণ আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্রকে এক অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করে। দাস প্রথাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং এই প্রথাকে মহাপাপ মনে করতেন। তাই লিঙ্কন যখন সভাপতিপদে নির্বাচিত হলেন, তখন দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভয়ে দক্ষিণের এগারটি রাষ্ট্র আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রসংঘ গঠন



আব্রাহাম লিংকন

করে। তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কেবলমাত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার জন্যই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। লিঙ্কন ঘোষণা করেন যে, কোন অঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার নেই। ফলে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রায় চার বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। দাসপ্রথার প্রচলন বন্ধ করতে হবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া হবে না—এই সঙ্কল্প নিয়ে লিঙ্কন অবিচলিতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। গৃহযুদ্ধের প্রথম



আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

পর্যায়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ কিছুটা সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের কাছে দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। উত্তরাঞ্চলের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল এই যে লোকসংখ্যায়, শিল্পে, অর্থবলে ও সামরিক শক্তিতে তারা অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ দিন পর লিঙ্কন এক উন্মাদের গুলিতে একটি প্রেক্ষাগৃহে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল অমর। এই গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকা থেকে দাসত্ব-প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

● ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ●

ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসার এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের মার্কস ও এঙ্গেলসের অবদান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় তার প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দুটি অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে এই বিপ্লবে যন্ত্রশিল্প প্রাধান্যলাভ করে এবং ইউরোপের সর্বত্র কলকারখানা স্থাপিত হয়। অধিক আর্থিক লাভের আশায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই চরম লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়। শিল্প-বিপ্লব প্রভাবিত প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এর ফলে প্রচুর আর্থিক সমাগম হয়। কিন্তু ধন বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য থাকায় এই দেশগুলিতে ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। ধনী শিল্পপতি দরিদ্র শ্রমিকদের বঞ্চিত করে লাভের বৃহৎ অংশ আত্মসাৎ করতে থাকে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফল সমাজতন্ত্রবাদ সৃষ্টি।



কার্ল মার্কস

সমাজতন্ত্রবাদকে প্রথম কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হলে একজন জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস্ (১৮১৬-১৮৮৩ খ্রীঃ)। জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে তাঁর জন্ম। শিক্ষালাভ করেন বন্ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় তিনি হেগেলের দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা

বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। হেগেলের কাছেই মার্কস এই শিক্ষালাভ করেন যে, ইতিহাসের কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয় এবং একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনার যোগাযোগ আছে। এ ছাড়াও তিনি ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লুই ব্লাঁ ও প্রাতডনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের প্রভাব মার্কসের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়। মার্কস শিক্ষালাভের পর সমাতন্ত্রবাদী হয়ে উঠেন এবং নিজ জীবন শ্রমিকদের কল্যাণে উৎসর্গ করেন।

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাশিয়ার সরকার তাঁর কার্যকলাপ সুনজরে দেখেননি এবং কিছুকাল পর তিনি প্রাশিয়া ত্যাগ করে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানে ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে ফরাসী সরকারও তাঁকে ফ্রান্স ত্যাগ করতে আদেশ দেন। তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে ব্রাসেল্‌সে আশ্রয় নেন। সেখানে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস নামে স্বনামধন্য সমাজতান্ত্রিকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা জন্মে। এঙ্গেলসের সাহায্যে মার্কস ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে তাঁর বিখ্যাত কমিউনিস্ট্‌ ম্যানিফেস্টো ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারই সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ধনতান্ত্রিক অত্যাচার ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পৃথিবীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।



ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কসের প্রধান রচনা ড্যাস ক্যাপিট্যাল। রচনাটিতে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা আলোচনা করে তার পশ্চাতে যে মূলনীতি কাজ করছে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কার্ল মার্কসের মতে, প্রত্যেক যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবে। তাঁর আর একটি বড়

সিদ্ধান্ত, প্রত্যেক যুগেই শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিয়েছে, অর্থনৈতিক কারণের জন্য এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণী শোষিত হচ্ছে। মূল কথা হ'ল মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতি হবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে। সেখানে কোন শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না ; জমি কারখানা প্রভৃতি সব কিছুই থাকবে সমাজের হাতে। এই ব্যবস্থায় একটি মাত্র শ্রেণী থাকবে শ্রমিক, এবং তার হাতেই থাকবে পূর্ণ ক্ষমতা। কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা ছিল সুযৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত। তিনি ছিলেন আধুনিক এবং প্রকৃত সমাজতন্ত্রের জনক।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. ভিয়েনা বৈঠক কাদের মধ্যে হয়েছিল ?
২. চতুঃশক্তি সম্মেলন কত খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল ?
৩. মেটারনিক কে ছিলেন ?
৪. ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত কি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ?
৫. কত খ্রীস্টাব্দের পর ইটালীতে জাতীয় আন্দোলন প্রবল হয় ?
৬. ম্যাৎসিনি কোন্ দেশের নেতা ? ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে সাফল্য এনেছিলেন কে ?
৭, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয়েছিল তার নাম কি ?
৮. ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা হন কে ?
৯. আব্রাহাম লিঙ্কনের জন্ম কত খ্রীস্টাব্দে ?
১০. কার্ল মার্কসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১, ভিয়েনা বৈঠকের মূল নীতিগুলি কি ছিল ? কোন্ নেতা এই বৈঠকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ?
২. চতুঃশক্তি সম্মেলন বলতে কি বোঝ ? এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
৩. ইটালীর ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাসে কাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ? এদের মধ্যে কার দান সবচেয়ে বেশী ? তিনি কিভাবে ঐক্যবদ্ধতায় সাহায্য করেছিলেন ?

৪. জার্মানির ঐক্যবদ্ধতা কিভাবে কার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল ?

৫. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ছিল ?

৬. কে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন ? তাঁর চেষ্টার প্রমাণ আমরা কিভাবে পাই ?

৭. ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্র-শিল্প প্রসারের কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?

● **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১. ভিয়েনা বৈঠক ও চতুঃশক্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? ফলাফল-ই বা কি হয়েছিল ?

২. ইটালীর ঐক্যবদ্ধতার ইতিহাস সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩. বিসমার্কের অধীনে কিভাবে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল লেখ।

৪. আমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রধান ভূমিকা কার ? এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৫. ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসার সম্পর্কে কি জান ? শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে মার্কস ও এঙ্গেলসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. **সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও ঃ**

ক. নেপোলিয়ন / প্রথম আলেকজাণ্ডার / মেটারনিক / বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপের জনসাধারণের কাম্য শান্তি, স্বাধীনতা নয়।

খ. ১৮৪৮ / ১৮৫২ / ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে কাউন্ট কাভুর পিডমণ্ট রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।

গ. নেপোলিয়ন / প্রথম উইলিয়ম / প্রথম আলেকজাণ্ডার যখন জার্মানীতে অভিযান করেছিলেন তখন জার্মানদের মনে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঘ. জার্মানিতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন কাভুর / বিসমার্ক/ ম্যাৎসিনি।

২. **শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ**

ক. রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে সম্মেলন হয়েছিল তাকে বলে——।

খ. ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে——পিডমণ্ট রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হন।

গ. কার্ল মার্কসের জন্ম জার্মানীর——পরিবারে।

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

পাশ্চাত্যের আঘাতে চীনের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন

প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীনের সঙ্গে বাইরের জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও আধুনিক যুগের সূচনা থেকে এই দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চীন অন্তর্মুখী অবস্থায় কাটায়। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা জোর করে চীনের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে বাইরের জগতের কাছে প্রকাশ করে।

ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনদেশে আফিম চালান দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। চীন সরকার দেশবাসীকে আফিম খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর কু-অভ্যাস হতে মুক্ত করার জন্য আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা অর্থের লোভে চীন সরকারের ঘোষণা অমান্য করে এই পাপ ব্যবসা চালাতে থাকে। এই উপলক্ষে চীন সরকার ও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ জাহাজ এরপর থেকে বিনা অনুমতিতে চীনের উপকূলে নোঙ্গর করতে পারবে না ; চীন সরকার এই মর্মে এক আদেশ জারি করলে ইংরেজপক্ষ সেই আদেশ মানতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে উভয় পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে বাদানুবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত ক্যাণ্টেন নদীর মোহনায় দুটি ইংরেজ জাহাজ চীনা জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করলে চীন ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এটাই প্রথম চীন যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ দু'বছরের কিছু বেশী সময় (১৮৪০-১৮৪২) চলেছিল। প্রায় সবকটি যুদ্ধে চীনাবাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীন সরকার ইংরেজ বণিকগণকে

নান্‌কিং-এর চুক্তি (১৮৪২ খ্রীঃ) দ্বারা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু অর্থ দিতে, হংকং বন্দরটি ব্রিটিশের কাছে ছেড়ে দিতে এবং ক্যান্টন ছাড়া আরও চারটি বন্দর, যথা—নিংপো, ফুচাও, সাংহাই, এময়-এ ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ ঃ প্রথম চীন যুদ্ধে ইংরেজদের অসামান্য সাফল্যের চীনের দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়। ক্রমে আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ ঐ পাঁচটি বন্দরে অবাধে ব্যবসা করতে শুরু করে। প্রায় পনের বছর পরে আফিম-এর ব্যবসা নিয়ে চীনের সঙ্গে ইংরেজদের আবার যুদ্ধ বাধে। এবারে ফ্রান্সও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধার কারণ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে জনৈক ফরাসী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারককে চীন কর্তৃপক্ষের আদেশে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স চীনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এদিকে একটি ইংরেজ জাহাজ চোরাই আফিম চালান দেবার সময় চীন কর্তৃপক্ষ সেটা আটক করে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইংলণ্ডের সঙ্গে চীনের প্রবল মতান্তর ঘটে। তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একযোগে চীনের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত বাহিনী বিনা বাধায় রাজধানী পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হলে চীন সম্রাট ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। দু-পক্ষের সম্মতি নিয়ে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে টিয়েনসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে চীন দেশ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হয়। চীন আরও এগারটি নতুন বন্দরে ইউরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। চীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পিকিং-এ বিদেশী দূতাবাস স্থাপনের অধিকার আদায় করা হয়। এই সন্ধিপত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শর্ত হ'ল বিদেশী জাতিগুলির অতিরাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভ। এই ক্ষমতাবলে

বিদেশীরা চীন সরকারের অধীনস্থ না হয়ে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অধীন থাকবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চীনের ছিল না। চি-ফু বন্দোবস্তের দ্বারা ইয়াংসি উপত্যকায় ইংলণ্ড একচ্ছত্র বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে এবং আরও চারটি বন্দরের উপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অবাধ বাণিজ্যিক অধিকার মেনে নেওয়া হয়। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অধিকার বিস্তার করে এবং ফ্রান্স, আনাম ও টন্‌কিন অধিকার করে।

আমেরিকা ভৌমিক অধিকার স্থাপনে আগ্রহী ছিল না। চীনের রাজনৈতিক সংহতি বজায় রাখার জন্য আমেরিকা সচেষ্ট ছিল এবং এ কারণে উন্মুক্তদ্বার-নীতি প্রচার করে। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল চীনে ইউরোপীয় দেশসমূহ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরাপর দেশের সঙ্গে বিরোধিতা না করে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপারে সকলেই চীনের সঙ্গে আদান-প্রদান স্বাভাবিক ভাবে করতে পারবে।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

চীনে বিদ্রোহ ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

তাইপিং বিদ্রোহ ১৮৫৩ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন যখন ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থপর আক্রমণ নীতি থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। মাঞ্চু সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য এই বিদ্রোহ শুরু। এটাই তাইপিং বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বিদ্রোহটি প্রথমে ধর্মান্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হাং-সিন-চুয়াং। তিনি নিজেকে স্বর্গ হতে আগত রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং স্বর্গরাজ্য নামে একটি নতুন রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন।

এই বিদ্রোহে প্রধানতঃ কৃষকগণই অংশগ্রহণ করে। সামন্তপ্রথা-প্রসূত অত্যাচারই ছিল কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদানের প্রধান

কারণ। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পিকিং-এর রাজদরবারের কয়েকজন প্রগতিশীল কর্মচারী বিশেষতঃ সম্রাট কুয়াং-সু বুঝতে পারেন যে চীনের পক্ষে সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। কাং ও লিয়াং নামে দু'জন উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে, একশ' দিনের সংস্কার নামে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করেন। এদের মধ্যে চীন বিদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, চীনের রক্ষণশীল কর্মচারীরা ইউরোপে শিক্ষা নেবে, পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব বিষয়ক শিক্ষা দ্বারা পরিবর্তিত হবে, মন্দির ও ধর্মাধিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক স্কুল ও কলেজে পরিণত করা হবে, সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হবে, অপ্রয়োজনীয় সরকারী পদ বিলুপ্ত করা হবে প্রভৃতি। কিন্তু এই সংস্কার কার্যকরী হয় নি। কারণ রাজা ও সংস্কারকদের কারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে চীনের সর্বত্র বিদেশীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ চীনবাসী একথা বুঝতে পারে যে বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক চীনের সাম্রাজ্য গ্রীস ও বাণিজ্য-প্রসার নীতি চীনের স্বার্থ বিরোধী। মাঞ্চু রাজবংশের দুর্বলতা যে এই নীতির জন্য দায়ী, একথা তারা উপলব্ধি করে। ফলে মাঞ্চু রাজবশংকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চীনে মুষ্টিযোদ্ধা নামে এক গোপন সমিতি গঠিত হয়। পাশ্চাত্য মনোভাবের পরিণতি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ। বিদেশীদের প্রতি আক্রমণাত্মক কার্য চালিয়ে বহু বিদেশী স্ত্রী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলির এক সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী বিদ্রোহী দলকে পরাজিত করে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। ইউরোপীয় দেশগুলি চীনের নিকট বিদ্রোহের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে।

বক্সার আন্দোলনের পর মাঞ্চু রাজবংশকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় সংস্কার সাধন করা। তাই ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী সু-জি ঘোষণাপত্র দ্বারা সামরিক সংস্কারের কথা প্রচার করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের আগে চীনে কোন আধুনিক সেনাবাহিনী ছিল না। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চীনে এক আধুনিক সেনাবাহিনী

গড়ে উঠে। জাপানের অনুকরণে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে চীনে একটি শাসনতন্ত্রসম্মত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টাও চলে। প্রথমেই একটি বৈদেশিক মন্ত্রণালয় খোলা হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ মন্ত্রণালয় ও ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বাণিজ্য-বিষয়ক মন্ত্রণালয় খোলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এতে কৃষি ও শিল্প বিভাগগুলি স্থান পায়।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা জাতীয় সভা আহ্বানের প্রথম পদক্ষেপ। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির অধিবেশন বসে এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি পার্লামেণ্ট আহ্বানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় সভা ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ৩রা অক্টোবর আহুত হয়।

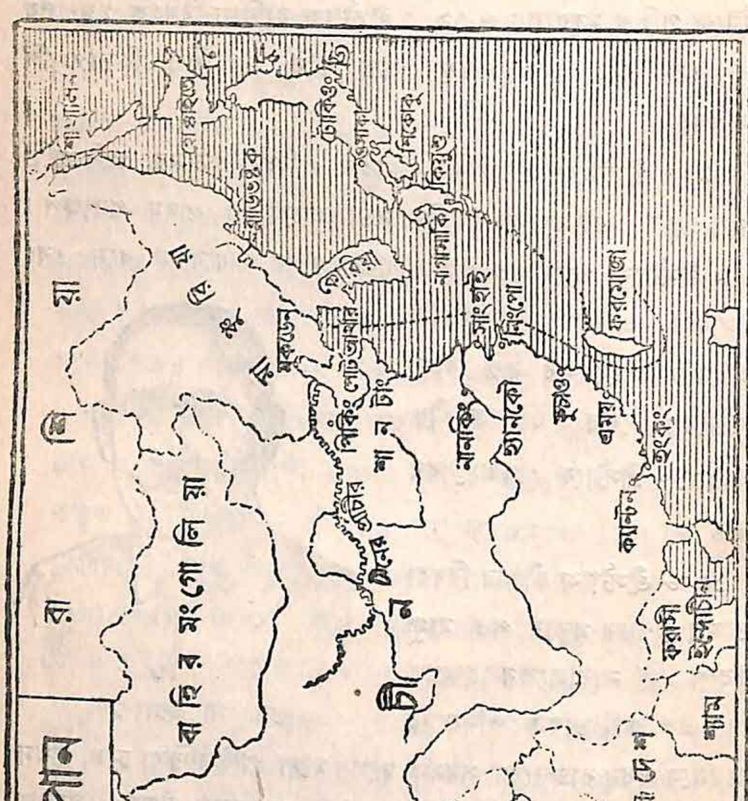


ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে চীনের বিধবা সাম্রাজ্ঞী সু-জির মৃত্যুর পর মাঞ্চু রাজবংশ এক নাবালকের হস্তগত হয়। এক অভিভাবক পরিষদের গঠন নিয়ে যখন রাজতন্ত্রের সমর্থক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তখন চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের ক্যাণ্টনকে কেন্দ্র করে ডাঃ সান- ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এক সাধারণতন্ত্রী দলের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মাঞ্চুর রাজবংশ পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাধারণতন্ত্রী দল এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা নান্‌কিং শহর অধিকার করে সেখানে এক অস্থায়ী সাধারণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করে। এই অবস্থায় চীনের নাবালক সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সমস্ত চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১২) খ্রীঃ। সান-ইয়াৎ-সেন সেই চীন

সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এইভাবে চীনের প্রথম গণবিপ্লব শেষ হয়।

মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনই ছিল



সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও চীনে গৃহ-বিবাদ চলতে থাকে। জেনারেল ইউ-য়ান-সিকাই ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি। তাঁর নেতৃত্বে চীন প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠুক এই

ছিল সান-ইয়াৎ-সেনের আশা। এই আশার বশবর্তী হয়ে তিনি প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করেন এবং ইউ-য়ান-সিকাইকে এই পদে নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেণ্ট হবার পর ইউ-য়ান সিকাই বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইউ-য়ান-সিকাই ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

বৃহৎ শক্তিরূপে জাপানের অভ্যুত্থান (১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত)

ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চীন দেশের ন্যায় জাপানও পৃথিবীর অপরাপর দেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত জাপানী সম্রাট (মিকাডো) ছিলেন আইনত দেশের সর্বেসর্বা। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল 'শগুন' উপাধিধারী এক অভিজাত চীন পরিবারের হাতে। 'শগুন'ই ছিলেন দেশের যথার্থ শাসনকর্তা। শগুনের পরেই ডাইমিও' বা সামন্তরা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইংলণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও জার্মানি চীনের ন্যায় জাপানের কাছ থেকে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার আদায় করে। এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে জাপানের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে জাপানীরা সর্বক্ষেত্রে নিজেদের দুর্বলতা ও হীনতা বুঝতে পারে। এদিকে 'শগুন' জাপানী সম্রাটের (মিকাডো) যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে এক স্বৈরাচারী ও স্বার্থপর শাসন শুরু করে। জাপানের যুব সম্প্রদায় জাপানের সম্রাটকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়।

এই নবচেতনার ফলে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে জাপানের সর্বত্র এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লব শুরু হয়। জাপানের সম্রাট মুৎসুহিতো শাসনের সমস্ত ক্ষমতা লাভ করেন। এরপর জাপানের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়।



সম্রাট মুৎসুহিতো

বিশেষজ্ঞদের বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ করে এনে জাপানের শিল্পের উন্নতি করা হয়। বাষ্পীয় যানবাহনের উন্নতি করা হয়। কলকারখানা স্থাপন, অল্পদিনের মধ্যে রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন এবং খনিগুলির উন্নতি সাধন করা হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে জাপান-সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে জাপানে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বিদেশ থেকে বহু শিক্ষককে আমন্ত্রণ করা হয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাতে দেশে প্রচারিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া এবং ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদেশীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত নতুন প্রণালী প্রয়োগ করে জাপান উনবিংশ শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই এক নতুন দেশরূপে পরিগণিত হয়।

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন করে জাপানে নির্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধিদের হাতে আইন রচনা ও কর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে জাপানে নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এভাবে প্রগতিশীল জাপানের অভ্যুত্থান হয়। পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুসরণে আধুনিকতার পথে এগিয়ে গেলেও জাপান তার জাতীয়তাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখে।

কালক্রমে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মত জাপানও চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যগ্র হয়ে উঠে। জাপানের দৃষ্টি পড়ে প্রথম কোরিয়ার উপর। কোরিয়া তখন চীনের অধীন করদ রাজ্য। কোরিয়ার অধিকার নিয়ে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চীন পরাজিত হয় ও কোরিয়া জাপানের আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ক্ষুদ্র জাপানের হাতে এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে বিশ্বের কাছে চীনের দুর্বলতা আরও প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে এবং কোরিয়াতে ক্ষমতা বিস্তার করার চেষ্টা করতে থাকে। এতে জাপান অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এই সময় ইংলণ্ডও রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ ভীত হয়ে পড়ে। এজন্য ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটি মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে জাপানের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের জন্য অনুরোধ করে। রাশিয়া জাপানের এই নির্দেশ পালন না করায় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ফলে রাশিয়া, কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য স্বীকার করে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া জাপানকে ছেড়ে দেয় (১৯০৫ খ্রীঃ)। এভাবে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম বলে মর্যাদা লাভ করে।

জাপানের কোরিয়া অধিকার ১৯০২ঃ ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ঈঙ্গ-জাপানী মৈত্রী চুক্তির ফলে জাপানের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই দুই দেশ চীনের সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত হয় বটে কিন্তু জাপান এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোরিয়া জাপানের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে জাপানী মন্ত্রীসভা কোরিয়াকে জাপানী

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর হার্বিনে জনৈক কোরিয়ান ভূতপূর্ব অভিভাবক যুবরাজ ইটোকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে জাপানে জনমত প্রবল হয়ে উঠে এবং অবিলম্বে কোরিয়াকে জাপানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তোলে। অবশেষে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ২২শে আগস্ট কোরিয়া জাপানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

জাপান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ এশিয়ার বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

যুদ্ধ ঘোষণার তিন দিন পর ইংলণ্ড জাপানকে প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মান রণপোত ধ্বংস করতে অনুরোধ করে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ৮ই আগস্ট জাপান জার্মানিকে এশিয়ার সকল সাগর ও মহাসাগরের জার্মান জাহাজ সমর্পণ করতে বলে এবং সান্টুং-এ কিয়াওচো অঞ্চলের উপর আধিপত্য ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। জার্মানি জাপানের এই চরম পত্র অগ্রাহ্য করলে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে আগস্ট জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পূর্ব এশিয়ায় জার্মান প্রভাব ধ্বংস করার এবং নিজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার অভাবনীয় সুযোগ জাপানের সামনে উপস্থিত হয়। ১০ই নভেম্বর জাপান সান্টুং অধিকার করে।

চীনের কাছে জাপানের ২১ দফা দাবীঃ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট একুশ দফা দাবি উপস্থিত করে। ২১ দফা দাবি পাঁচভাগে জাপান চীনের কাছে পাঠায়। (১) সান্টুং-এর উপর থেকে জাপান তার অধিকার ত্যাগ করবে না। (২) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব মোঙ্গলিয়ার উপর জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে (৩) ইয়াং-সি উপত্যকার কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জাপানকে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের অধিকার দিতে হবে (৪) উপকুল অঞ্চলে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করতে হবে (৫) চীন সরকারের উচ্চ পদগুলিতে জাপানী

উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে জাপান তার বেশীর ভাগ দাবী আদায় করে নেয়।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. কোন্ শতাব্দী থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়?
২. ইংলণ্ড চীনদেশে কি চালান দিত?
৩. কোন সন্ধির দ্বারা প্রথম চীন যুদ্ধের অবসান হয়?
৪. দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়?
৫. চীনের সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি কে?
৬. জাপানের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক কখন স্থাপিত হয়?
৭. রুশ জাপান যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. অহিফেন যুদ্ধের কারণ কি ছিল?
২. কোন্ দেশ প্রথম 'উন্মুক্ত দ্বার' নীতি ঘোষণা করে এবং কেন?
৩. 'তাইপিং বিদ্রোহ' বলতে কি বোঝায়? এই বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি বর্ণনা কর।
৪. চীনে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিভাবে? নেতা কে ছিলেন?
৫. চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের কারণ কি? কোন্ পক্ষের জয় হয়?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. চীনের সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কেন সংঘর্ষ দেখা দেয়?
২. চীনে কেন বিদ্রোহ দেখা দেয়? চীনে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র উদ্ভবের পিছনে এই বিদ্রোহ কতখানি দায়ী?
৩. জাপানের সঙ্গে চীনের কি কারণে সংঘর্ষ বাধে? জাপানের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণের কারণ কি?

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. ——পর থেকে চীনের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়।

খ. —খ্রীস্টাব্দে টিয়িনসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গ. —খ্রীস্টাব্দে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ঘ. —খ্রীস্টাব্দে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে —চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২. সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

ক. জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়—
১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে □ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে □ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে □

খ. জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—
১৯০০ খ্রীস্টাব্দে □ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে □ ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে □

১১ | বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮–১৯১৪ খ্রীঃ

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

নতুন শাসনব্যবস্থা

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ উপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসনকে দায়ী করা হয়। ভারতের মত বিশাল দেশকে একটি বণিক সংস্থার শাসনাধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে ভারতের শাসনভার বৃটিশ রাজা ও পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে। ভারতের শাসন বিভাগের সব ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালে রাজস্ব ও বিচার বিভাগের সংস্কার করা হয়। আয়কর ও আমদানি শুল্ক স্থাপন এবং তিনটি প্রেসিডেন্সীতে একটি করে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্যানিং-এর শাসনকালে ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের পর ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্মধারা একটি শান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইংরেজ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর থেকে শাসনভার গ্রহণ করার পরই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশীয় রাজাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। রাজশক্তি ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে ভারতে এক উন্নত ও দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

সাম্রাজ্য বিস্তার

ভারতের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বলতে সিন্ধু নদ ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল বোঝায়। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিটন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অঞ্চল অধিকার করে ভারতের বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক সীমান্ত স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করেন। লর্ড লিটন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং আগ্রাসী নীতির ভক্ত। তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব সরকারকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করার নির্দেশ দেন। ক্রমে পেশোয়ার, হাজরা, কোহাট, বান্নু, ডেরা গাজি খাঁ, ডেরা ইসলাইল্ খাঁ অঞ্চল বৃটিশ অধিকারে আসে।

লর্ড ল্যান্সডাউন, স্যার মার্টিনার ডুরাণ্ডকে কাবুলে দূত পাঠিয়ে ডুরাণ্ড চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী (১৮৯৩ খ্রীঃ) আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়। এর নাম ডুরাণ্ড লাইন। লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট লিটনের আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেন। ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য উত্তর পশ্চিমে আফগানিস্তানের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হলে স্বভাবতঃই আফগানিস্তানের দিকে ইংরেজ শাসকগণের দৃষ্টি পড়ে। এই একই কারণে লর্ড লিটন কালাত খানের কাছ থেকে কোয়েটা দখল করে সেনা ব্যারাক স্থাপন করেন এবং গিলগিটে একজন বৃটিশ এজেন্ট নিয়োগ করেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজ থিব আত্মসমর্পণ করেন। ব্রহ্মরাজের আসাম আক্রমণ, ইংরেজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং কুশাসনের অজুহাতে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজ শক্তি

সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়েই ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। লর্ড কার্জন তিব্বত জয়ের চেষ্টা করেন, পরে অবশ্য ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ সন্ধি দ্বারা তিব্বতের নিরপেক্ষতা মেনে নেওয়া হয়।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সময় রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, দয়ানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনে।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মকে কু-সংস্কার মুক্ত করেন এবং পৌত্তলিক ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জন করে বেদ ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করে গঠিত নিজ ধর্মমত পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে এই আত্মীয় সভাই ব্রাহ্মসভায় রূপান্তরিত হয়। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ও পুতুলপূজার বিরোধী। রামমোহন বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ না করলেও জাতিভেদ প্রথার কুফলগুলির নিন্দা করেন। বেন্টিঙ্ক-এর সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা সংস্কার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাজা রামমোহন বহু-বিবাহ ও বাল্য বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু বিধবারা যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে, রামমোহন সেজন্যও চেষ্টা করেন। এদেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষা বিস্তারে অংশগ্রহণ করতে রামমোহন আহ্বান করেন।



রাজা রামমোহন রায়

রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহ্য বহন করেন।

আর্য সমাজও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসরণ করেন। এর প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী।

হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক ডিরোজিও-র প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দুসমাজে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে বিধবা বিবাহের সমর্থনে একটি বই লেখেন, এই বইতে তিনি কৌলীন্য-প্রথার দোষ ত্রুটিগুলিও আলোচনা করেন। বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব হ'ল বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা এবং বাল্য-বিধবাদের-বিবাহ প্রচলন করা।

মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন দিল্লীর স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি ভারতীয় মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আলিগড়ে মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই কলেজ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।


রামকৃষ্ণ পরমহংস

ইসলাম ধর্মে ও মুসলমান সমাজে সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে কলিকাতায় মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক সমিতি স্থাপিত হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস সমস্ত ধর্মের সমন্বয় সাধন করে ও ধর্মে সহজ সরল মতবাদ প্রচার করে হিন্দুধর্মে নতুন চেতনার সঞ্চার করেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসেবা ও মানুষের নৈতিক উন্নয়নই মিশনের ব্রত।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●
জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে ভারতবাসীদের মনে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। ভারতের প্রায় এক'শ বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতীয়রা ইউরোপীয় দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং ইউ-রোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়রা এক নতুন-জ্ঞান জগতের সন্ধান লাভ করে। বিভিন্ন দেশের বই পড়ে



স্বামী বিবেকানন্দ



বঙ্কিমচন্দ্র

পাশ্চাত্য দেশের মানুষ কীভাবে জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলে সে খবরও শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট অজানা ছিল না। আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, স্পেন, পোর্তুগাল, ইটালী ও জার্মানির গণ-আন্দোলন শিক্ষিত ভারতীয়-দের মনে এনেছিল নতুন প্রেরণা। অপরদিকে রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশবরেণ্য মনীষীদের



রবীন্দ্রনাথ

নতুন চিন্তাধারার ফলে ভারতবাসীর মধ্যে এক নব-জাগরণের সৃষ্টি

করে। ভারতীয়রা এই সময় ধর্মশাস্ত্রগুলির সমালোচনা, নতুন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে থাকেন। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও উদারনৈতিক ভাবধারাগুলির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয়রা মধ্যযুগের কু-সংস্কার ত্যাগ করে। তাঁদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদ।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে একটি আইন প্রণয়ন এবং অস্ত্র আইন দ্বারা ভারতবাসীর পক্ষে বিনানুমতিতে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে ভারতবাসী ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলনের ঢেউ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকেও আঘাত হানে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের আইন সদস্য ইলবার্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় বিচারকেরা শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার করতে পারবে। এতে ইংরেজরা অপমানিত বোধ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে আন্দোলন আরম্ভ করে। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আন্দোলনের জন্য চাঁদা তুলে সর্বভারতীয় জাতীয় তহবিল গঠন করেন এবং ঐ বছরই কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় সমিতি আহ্বান করেন। কলিকাতায় এর প্রথম অধিবেশন হয়।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনের আগেই এলেন অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত উদারচেতা সিভিলিয়ান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে তিনি সর্বভারতীয়

ভিত্তিতে একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই চিঠির মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের বীজ নিহিত ছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। এই সময় কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনও আহূত হয়েছিল, ফলে সুরেন্দ্রনাথ বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই। ভারতের জাতীয় সমিতি অচিরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস।


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

● ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ●

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫–১৯১৪)

ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও দিনে দিনে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকে সুনজরে দেখতে পারেনি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথমে ইংরেজ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তাই তাঁরা কেবলমাত্র আবেদনের মধ্য দিয়ে সরকারের কাছে দাবী আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার কিছুতেই কংগ্রেসের দাবীকে গুরুত্ব দিতে চাননি। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়। এই সময় একটি চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। এই দল মনে করত যে দাবী করে বা বক্তৃতা দিয়ে অভাব অভিযোগের প্রতিকার হয় না, তার জন্য প্রয়োজন

আন্দোলনের। বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পাল, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এই চরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন। তিলক ঘোষণা করেন যে 'স্বরাজ' প্রতিটি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার।

শাসনকাজের সুবিধার অজুহাতে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিভেদ নীতির সাহায্যে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান প্রধান এলাকায় বিভক্ত করা এবং বাংলার জাতীয়-ঐক্য ও জাতীয় আন্দোলন ধ্বংস করা। কিন্তু বাঙালী জাতি লর্ড কার্জনের এই পরিকল্পনা মুখ বুজে সহ্য করেনি। সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে শুরু হয় এক ব্যাপক আন্দোলন। সারা দেশ জুড়ে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। ধীরে ধীরে এই ঝড় রূপান্তরিত হয় বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনে।



অরবিন্দ ঘোষ



লালা লাজপৎ রায়



বাল গঙ্গাধর তিলক

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে অর্থনৈতিক

অসহযোগ। অর্থাৎ বিলাতী পণ্য মাত্রেই বয়কট বা বর্জন করা। শুধু বয়কট করলে চলবে না—নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের প্রয়োজন। তাই শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা এবং সভা ও শোভাযাত্রার সাহায্যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুরতা বাংলায় এক বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রথমে বাংলা পরে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও ভারতের অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হয় গুপ্ত সমিতি। এইসব গুপ্ত সমিতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় ভারতীয়দের বিপ্লবী আন্দোলন। কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করতে চেষ্টা করে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগে দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।



ক্ষুদিরাম

ভারতে সশস্ত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ হয় অনুশীলন সমিতি নামে একটি গুপ্ত সমিতি; সমিতির সর্বাধিনায়ক ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী প্রমথনাথ মিত্র। অনুশীলন সমিতি ছাড়া যুগান্তর দল নামে অপর একটি গোষ্ঠীও সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বিপ্লবীদের আদর্শ ও মতবাদ প্রচারের জন্য ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যুগান্তর নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারিন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নাথ

দত্ত প্রমুখ আন্দোলনকারীরা এই পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো বিদেশ থেকে বোমা তৈরীর পদ্ধতি শিখে আসেন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদল নতুন অগ্নি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নতুন অগ্নিযুদ্ধে। বাংলা তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, মাষ্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট নেতা যুক্ত ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংহকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবে আবার বিপ্লব দেখা দেয় এবং ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় পাঞ্জাবীদের প্রতিষ্ঠিত গদর পার্টি ভারতে বিপ্লব ঘটাতে তৎপর হয়।



রাসবিহারী বসু

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে বিনায়ক দামোদর সাভারকর অভিনব ভারত নামে একটি বিপ্লবাত্মক সমিতি গঠন করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সাভারকর লণ্ডনে চলে গেলেও সমিতিটি বিপ্লবী আদর্শের প্রচার বৃদ্ধি করে এবং মহারাষ্ট্রের বহু জায়গায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

- **মৌখিক প্রশ্ন :**

১. কার শাসনকালে ভারতে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

২. বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে কোন মনীষী প্রথম সমালোচনা করেন?

৩. ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন দ্বারা ভারতের শাসনক্ষেত্রে কিসের প্রাধান্য স্থাপিত হয়?

৪. ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কোন্ আইন দ্বারা ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে?

৫. মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য কে প্রথম উদ্যোগী হন ?
৬. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করায় কি সুফল দেখা দেয় ?
২. লর্ড লিটনের রাজত্বকালে রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে কি নীতি গৃহীত হয় ?
৩. রাজা রামমোহন সমাজ সংস্কারক হিসেবে কি করেছিলেন ?
৪. ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে নতুন যুগের সূচনা হয় ?
৫. বঙ্গ-ভঙ্গ আইনের বিরুদ্ধে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?
৬. উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু ও শেষ হয় ?

● **রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর ভারতে যে নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, সে সম্বন্ধে লেখ।
২. লর্ড লিটনের রাজ্যবিস্তার নীতি কি ছিল ? এর ফলাফল বর্ণনা কর।
৩. ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ কি ? কিভাবে এই বিপ্লব সফলতা লাভ করে ?
৪. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমাগ্রসরের কাহিনীটি লেখ।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
১. ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের— ।
২. অক্টোভিয়ান হিউম ছিলেন একজন অবসর প্রাপ্ত— ।
৩. ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন।

খ. সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ
১. আত্মীয় সভা স্থাপন করেন—
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর □ রাজা রামমোহন রায় □ বিপিন পাল □
২. বঙ্গ-ভঙ্গ করা হয়—
১৯০৬ সালে □ ১৯০৫ সালে □ ১৯০৪ সালে □
৩. বন্দেমাতরম্ রচনা করেন—
রবীন্দ্রনাথ □ বঙ্কিমচন্দ্র □ শরৎচন্দ্র □

১২ | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

কারণঃ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ফলে ইউরোপের দেশগুলি নিজ নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এই কারণে শক্তিশালী দেশগুলি দুর্বল দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে জার্মানিই অগ্রণী।

বিসমার্কের অবসর গ্রহণের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানিকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন। জার্মানিকে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর করে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স আলসেস্ ও লোরেন হারায়। এই পরাজয়ের কথা কখনও ফ্রান্স ভোলেনি। ভবিষ্যতে ফ্রান্সই ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বিসমার্ক অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে মিত্রতা করেন। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে রাশিয়ার সম্বন্ধ ভাল ছিল না। সুতরাং অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সানন্দে জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। এই সময় ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ইটালী জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা লাভে ব্যগ্র হয়ে উঠে। ফলে জার্মানি, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী, ইটালীর মধ্যে একটি আত্মরক্ষামূলক ত্রি-শক্তি-চুক্তি হয়।

জার্মনির এই শক্তি বৃদ্ধিতে ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তিগুলি শঙ্কা বোধ করে। এতদিন শিল্প-বাণিজ্য, সাম্রাজ্য স্থাপন এবং নৌ-শক্তিতে ইংলণ্ডই ছিল ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। তিনটি ক্ষেত্রেই জার্মানির

প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ইংলণ্ডের স্বার্থে আঘাত লাগে এবং এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়।

এদিকে ফ্রান্স ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে জার্মানির নিকট পরাজিত হয়ে রাইন অঞ্চল আলসেস্-লোরেন প্রভৃতি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হওয়ায় ফ্রান্স জার্মানির উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এছাড়া ফরাসীরা জার্মানির দিক থেকে পুনরাক্রমণের ভয়েও ভীত ছিল। ফরাসী জাতির মনে জার্মানির প্রতি বিদ্বেষ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। জার্মানির নতুন বৈদেশিক নীতিতেও ফ্রান্স আতঙ্কিত হয়।

কাইজার উইলিয়াম তুরস্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেন ; ঐ অঞ্চলের উপর রাশিয়ার লোভ ছিল। সুতরাং ঐ অঞ্চলে রাশিয়া ও জার্মানির স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়। এক কথায় কাইজার উইলি-য়ামের বৈদেশিক নীতির ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই সাধারণ শত্রুতাই এই তিন শক্তিকে জার্মানির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে ত্রি-শক্তি চুক্তির প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ট্রিপল আঁতাত বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী স্থাপিত হয়। ইউরোপ দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়। দু'পক্ষই যুদ্ধের আশঙ্কায় সামরিক ও নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে, অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তখন ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে সার্ভিয়া নামে একটি ছোট দেশ ছিল। কিন্তু বহু সার্ভ অষ্ট্রীয়ার অধীন ছিল। তারা সার্ভিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। এজন্য তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ২৮শে জুন একজন বিপ্লবী সার্ভ অষ্ট্রীয়ার রাজধানী সারাজেভো শহরে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ও তাঁর পত্নীকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং কতকগুলি শর্ত অবিলম্বে পূরণের দাবী

জানিয়ে সার্ভিয়ার কাছে চরমপত্র প্রেরণ করে। চরম পত্রের সমস্ত দাবী সার্ভিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়া আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়া সার্ভিয়ার পক্ষে যোগ দেয় কারণ রাশিয়ানরা সার্ভিয়ানদের মত জাতিতে ছিল স্লাভ। জার্মানি অষ্ট্রীয়ার পক্ষ অবলম্বন করে ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গেও যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ক্রমে যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাপকতা ঃ এই যুদ্ধই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান শক্তিগুলি এতে যোগ দেয়। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম আর কখনও ঘটেনি। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানে উন্নতির ফলে এই যুদ্ধ অনেক বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠে। এই যুদ্ধে যেসব নতুন মারণাস্ত্রের প্রচলন হয় আগে তা কল্পনারও অতীত ছিল। প্রথম বোমারু বিমান বাহিনী ও সমুদ্রে শত্রু জাহাজ ধ্বংস করার জন্য সাবমেরিণ (ডুবো জাহাজ) প্রচলন হয়। স্থলযুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয় ট্যাঙ্ক, বড় বড় কামান, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি। এইসব ভীষণ অস্ত্রের প্রচলনে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক রূপ বহুগুণে বেড়ে যায়। এই যুদ্ধ প্রায় চার বছর চলেছিল। কমবেশী আশি লক্ষ লোক নিহত ও আড়াই লক্ষ লোক আহত হয়। অন্যভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল বহু মানুষ। বিশ্বের ইতিহাসে এই ধরণের যুদ্ধ পূর্বে আর হয় নি।

ফলাফল ঃ চার বছর যুদ্ধের পর জার্মানি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় (১১ই নভেম্বর ১৯১৮ খ্রীঃ)। এই দিনটি এখনও যুদ্ধ বিরতির দিন হিসাবে পালিত হয়। ভার্সাই শহরে বিজেতা ও বিজিত শক্তিগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় (১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে)। যুদ্ধের জন্য একমাত্র জার্মানিকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয় এবং এ কারণে তাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। জার্মানির শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে বিজয়ী শক্তিগুলি জার্মানির দু'টি প্রদেশ ফ্রান্সকে দেয়। যুদ্ধের

শর্ত অনুসারে জার্মানির সমস্ত উপনিবেশগুলি কেড়ে নিয়ে বিজয়ী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। জার্মানির সৈন্যসংখ্যা সীমিত করা হয়। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্র শক্তিকে প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করে হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করা হয়। সন্ধির শর্তের এই কঠোরতায় জার্মানি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল এবং প্রথম থেকেই ভার্সাই সন্ধির শর্ত অমান্য করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিপত্রের মধ্যে নিহিত ছিল।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ভারত ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের মিত্রপক্ষকে সাহায্যদানের কারণঃ ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে ভারতও বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় কিংবা ভারতীয় সৈন্য ও সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগানোর সময় ভারতবাসীর কোন সম্মতি গ্রহণ করা হয় নি। তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধ বিজয়ে ভারতের যথেষ্ট অবদান ছিল। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অর্থও গ্রহণ করা হয়, যার ফলে ভারতের জাতীয় ঋণ শতকরা তিরিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে যোগ না দিলেও ভারতীয় নেতারা যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ভারতবাসীর এই আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্য দেবে এবং ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে। মিত্রশক্তিবর্গ ঘোষণা করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নয়, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এই মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের এই ঘোষণাও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকের মনে মিথ্যা আশার সঞ্চার করে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং জনসাধারণের অসন্তোষ: প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে ভারতে খাদ্যাভাব এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। যুদ্ধের সময় পরিবহণ ব্যবস্থার অসুবিধার ফলে রপ্তানীযোগ্য কাঁচামালের সমস্তটা বিক্রী করা সম্ভব হয় নি। আবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধারণ ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পায়। বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় পুঁজিপতিদের সামনে অর্থ বিনিয়োগের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলেও শিল্প-পণ্য তৈরীর উপযোগী কলকারখানার অভাবে তারা সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করতে পারে নি। তা ছাড়া যুদ্ধের পর বিদেশের শিল্পজাত পণ্য আবার আসতে থাকায় নতুন ভারতীয় শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

ভারতে ও বিদেশে বিপ্লবীদের কার্যাবলী: ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটিশ শক্তি বিব্রত হয়। এই সুযোগে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে বিপ্লবীরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী এবং সারা দেশ জুড়ে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা চলতে থাকে। বিদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর জন্য বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেরম্ব গুপ্ত প্রভৃতি চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্থির হয় ঐ দিন সমস্ত জায়গায় ট্রেজারী লুণ্ঠন এবং যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে তাদের হত্যা বা বন্দী করা হবে। কিন্তু ইংরেজরা আগেই এই অভ্যুত্থানের খবর পাওয়ায় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) নির্দেশে বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফাদার মার্টিন ছদ্মনামে নরেন্দ্রনাথ

ভাটাচার্য জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় যাত্রা করেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা অবশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে 'মেভারিক' নামে জাহাজ বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র বহন করছে সংবাদ পেয়ে বাঘা যতীন চারজন সঙ্গী নিয়ে বালেশ্বরে যান। পুলিশ তাঁদের উপস্থিতির খবর জানতে পারায়, তাঁরা বুড়ীবালাম নদীর তীরে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এক বিরাট পুলিশ বাহিনী জঙ্গলটি ঘেরাও করে। পলায়নের আর কোনও উপায় নাই জেনে এঁরা পুলিশের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর বাঘা যতীন গুরুতররূপে আহত হন। সঙ্গীরা আত্মসমর্পণ করেন। ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এন, এন, রায় নামে পরিচিত) ভারতের ভিতরে বিপ্লব পরিচালনা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মালয়, চীন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করতে না পারলেও চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিপ্লবী সংগ্রামে নরেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।



এন. এন. রায়

আমেরিকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর পার্টি (Ghadar Praty) নামে একটা রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে সেই সুযোগে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য তাঁরা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা'ক ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে

অর্থসংগ্রহ করে তাঁরা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক পাঞ্জাবে পাঠালেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। গদর পার্টির কর্মসূচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল। সেনবাহিনীর মধ্যেও বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার চেষ্টারও কোনও ত্রুটি বিপ্লবীরা করেন নি।

হোমরুল আন্দোলন: ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে যখন অ্যানী বেসান্ত ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল লীগের বিষয় জেনে ভারতেও এইরূপ একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করেছিলেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেসে বেসান্ত হোমরুল আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিলকও এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে বেসান্ত হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্থাটি কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে বিস্তার লাভ করল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশনে হোমরুল আন্দোলনকারিরা কংগ্রেসের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হলেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হোমরুল লীগ স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে জনমত বিস্তার করেছিলেন। হোমরুল আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভের জন্য সচেষ্ট হন। বেসান্ত ও তিলক যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়ে রাজনৈতিক দাবী আদায় করতে চাইলেন।


অ্যানী বেসান্ত

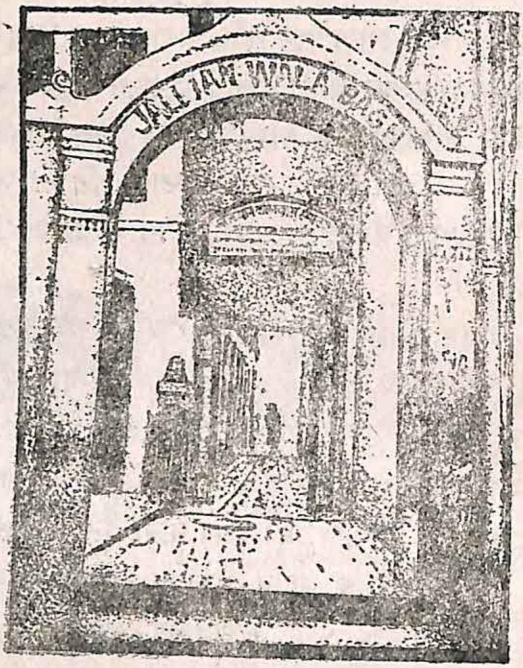
মুসলমানদের অসন্তোষ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার, তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে তুরস্কের বিদ্রোহী অমুসলমান প্রজাদের ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা দান প্রভৃতি কারণে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মৌ চুক্তি, ১৯১৬ ঃ এরপর হিন্দু-মুসলমানেরা সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার বিষয় চিন্তা করেন। মুসলীম লীগের নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার উদ্যোগে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হল যে, (১) কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে শাসনতান্ত্রিক দাবী জানাবে। (২) লীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজে'র আদর্শ মেনে নেবে।

রাওলাট আইন, ১৯১৯ ঃ রাওলাট আইন অনুসারে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য নানা ব্যবস্থা গৃহীত হল। এই আইন দ্বারা সন্ত্রাসবাদীদের বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা, আপিলের সুযোগ না দেওয়া, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোনও কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার এবং সংবাদপত্রের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। আইন বিধিবদ্ধ হবার পর সমগ্র ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল প্রতিবাদ সপ্তাহের আহ্বান পালনের ডাক দেওয়া হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঃ রাওলাট আইনের প্রতিবাদ ৬ই এপ্রিল শান্তিপূর্ণভাবে অমৃতসরে পালিত হল। এই শহরের দু'জন জনপ্রিয় নেতা ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলিউকে সরকার জনসভায় বক্তৃতা করতে অনুমতি না দেওয়ায় জনগণ বিক্ষুব্ধ হলেও কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেনি। ১০ই এপ্রিল এই দুই নেতাকে তাঁদের বাসস্থান থেকে অপসারিত করে এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। সংবাদটি প্রচারিত হলে শহরে হরতাল পালিত হল। এই দুই নেতার মুক্তি দাবী জানিয়ে শহরের প্রধান পথগুলিতে শোভাযাত্রা বের হল। 'হলগেট ব্রিজ' নামে রেলপথের সংযোগস্থলে

নিরস্ত্র শোভাযাত্রীর উপর গুলি বর্ষণ করে কুড়ি থেকে ত্রিশ জন ব্যক্তিকে হতাহত করা হল। পুলিশের গুলিতে নিহতদের শবদেহ নিয়ে ১১ই এপ্রিল শান্তিপূর্ণ ভাবে এক শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করল। কিন্তু এই দিন বিকালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার এসে



জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশ পথ

সামরিক আইন জারী করলেন। সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হল। ১৩ই এপ্রিল বিকাল ৪-৩০ মিনিটে এক জনসভা আহূত হল। ডায়ার এই জনসভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকলেও জনগণকে সতর্ক করার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। সভা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ডায়ার অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবেশ করে অতর্কিত ও ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করে ৩৭৯ জনকে নিহত এবং ১২০০ ব্যক্তিকে আহত করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। স্যার

শঙ্করণ নায়ার বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এই ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের দায়িত্ব নির্দ্ধারণের জন্য ভারত সরকার লর্ড হাণ্টারকে সভাপতি করে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন (অক্টোবর, ১৯১৯)। হাণ্টার কমিটি প্রকৃত অপরাধীদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করলেন। এতে গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ব্রিটিশ জাতি ও সরকারের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের উচ্চ ধারণার পরিবর্তন ঘটে। সরকারের এই আচরণ গান্ধীজীকে এরপর ইংরেজদের সহযোগীর পরিবর্তে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার সমূহের জন্য প্রস্তাব ঃ ভারতে হোম-রুল আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে দেখে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সচিব মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ সরকারের আদর্শ হল ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় স্থান দিয়ে ভারতে স্বায়ত্বশাসন চালু করা। মণ্টেগুর ঘোষণার পর ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ এবং গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ভারত-সচিব মণ্টেগু এবং তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল চেমস্‌ফোর্ড ভারতের শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে দেখা গেল যে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী আদৌ মেনে নেওয়া হয়নি।

অসহযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত ঃ ইংরেজ সরকারের ন্যায় বিচারের প্রতি গান্ধীজীর দীর্ঘকাল আস্থা ছিল। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনা, পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রয়োগ ও হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট তাঁকে হতাশ করেছিল। এই সময় কংগ্রেস চরমপন্থী দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়েছিল।

ইংরেজ সরকার তুরস্কের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এই

অবস্থায় গান্ধীজী নিঃসন্দেহ ছিলেন যে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলে মুসলমানরা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেবে। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস এই সময় ঘোষণা করে যে যতদিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন ভারতবাসীর পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

জাতীয় নেতারূপে গান্ধীজীর অভ্যুত্থান ঃ ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়ের এক বৈশ্য পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংলণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর ভারতে ফিরে এসে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। গান্ধী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আইন ব্যবসার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শেতাঙ্গদের অত্যাচার তাঁর মানবতাবোধকে আহত করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে গান্ধীজী এক নূতন অস্ত্র—'সত্যাগ্রহ' ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেন। সত্যাগ্রহের দুটি উপাদান হল 'সত্য' এবং 'অহিংসা'। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভাগে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে বিহারের অন্তর্গত চম্পারণে ও গুজরাটের অন্তর্গত কয়রা জেলার কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং আমেদাবাদে বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মত এই তিনটি ক্ষেত্রেও সত্যাগ্রহের জয় হল। এইভাবে গান্ধীজী কৃষক, শ্রমিক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হবার পথ প্রস্তুত করেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত-শাসন আইনে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার যতটুকু স্বীকৃত হল তা গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের ইতিহাসে 'গান্ধী-যুগ' আরম্ভ হল।

অনুশীলনী

● মৌখিক প্রশ্ন :

১. কোন্ নেতার অধীনে জার্মানি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়?
২. জার্মানির কোন্ সম্রাটের স্বপ্ন ছিল জার্মানিকে পৃথিবীর অধীশ্বর করে তোলার ?
৩. কত খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় ?
৪. বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে কোন কোন দেশ ছিল ?
৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত কোন পক্ষকে সাহয্য দান করেছিল ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. কিভাবে জার্মানি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল ?
২. জার্মানির সঙ্গে কি কারণে বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?
৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং কিভাবে শুরু হয় ?
৪. জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের ফল কি হয়েছিল ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি ? এই বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানী ছাড়া আর কোন কোন জাতিকে দায়ী করা যায় ?
২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা বর্ণনা কর।
৩. ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল—এই উক্তির তাৎপর্য বর্ণনা কর।
৪. ভারতে এবং বিদেশে বিপ্লবীদের কার্যাবলী সম্পর্কে কি জান লেখ।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বিসমার্ক অবসর গ্রহণের পর—জার্মানীকে আরও বেশী শক্তিশালী করে তোলেন।
২. ফ্রান্স ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে—যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজিত হয়।
৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রায়—লক্ষ নিহত এবং—লক্ষ লোক আহত হয়।

১৩ | রুশ-বিপ্লব

কারণঃ বিশ্বের ইতিহাসে রুশ-বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব একাধারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের অবসান ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রচলন আধুনিক ইতিহাসের অবিস্মরণীয় পঞ্জী।

রাশিয়া আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বিশাল দেশ হলেও প্রগতিশীল পশ্চিম ইউরোপ থেকে অনেক পিছনে পড়ে ছিল। মধ্যযুগের জমিদার-দের মত তখন রাশিয়ার অভিজাত বংশের লোকেরা রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। এদের সকলের উপরে ছিলেন সমগ্র রাশিয়ার সম্রাট' তাঁর উপাধি ছিল 'জার'। ঈশ্বরের প্রতিনিধি জার রাজবংশের ও অভিজাতদের স্বার্থরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে যথেচ্ছ রাজ্যশাসন করতেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের যাবতীয় ত্রুটি জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশের কৃষক, শিল্প-শ্রমিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জারের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গভীর বিক্ষোভ দেখা দেয়। টলষ্টয় প্রভৃতি রাশিয়ার খ্যাতনামা চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে রুশজন-সাধারণের দুরবস্থা ও জার শাসনের অত্যাচারের কথা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানের হাতে পরা-জয়ের ফলে জারের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেই সুযোগে বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ দল একত্রে একটা ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। নিকোলাস ভীত হয়ে ডুমা নামে এক জাতীয় সভা গঠন করেন। কিন্তু এই জাতীয় সভার অধিকাংশই স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে ছিলেন বলে শাসনব্যবস্থার কোন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়নি।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের নাম ছিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলশেভিক নামে পরিচিত ছিল। 'বলশেভিক' কথাটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাশিয়ার এই বিপ্লব বলশেভিক দলের নেতাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল বলে এই বিপ্লবকে বলশেভিক বিপ্লব বলা হয়। বলশেভিক দল কার্ল মার্কসের মতবাদে বিশ্বাসী। এরাই পরে কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। কার্ল মার্কস্ যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, রুশ বিপ্লবীরা সেই মতবাদকেই বাস্তব রূপ দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মধ্যে কার্ল মার্কস্ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে বর্তমান সমাজ—যে সমাজে জমিদার, কারখানার মালিক ও মুষ্টিমেয় ধনিকের প্রাধান্য—সে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। তার পরিবর্তে ,শ্রমজীবী মজুর ও কৃষকেরা শক্তিশালী হয়ে সমাজ ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। রুশ বিপ্লবে যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা মার্কসের মতবাদকেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সার্থক করবার চেষ্টা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপের মত রাশিয়ায় কিছু কিছু যান্ত্রিক শিল্পেরও প্রচলন হয়, তবে এই যান্ত্রিক শিল্পগুলি ছিল বড় শহরে সীমাবদ্ধ এবং এগুলির মূলধন ছিল প্রধানতঃ ধনবানদের হাতে। রাশিয়াতে শিল্পযুগের কুফল শ্রমিক নিষ্পেষণ দেখা দেয়। এর ফলে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিস্তারলাভ করে ও কার্ল মার্কসের ভাবধারার প্রভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে উঠে। এই দলের নেতা লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ)। তিনি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অনেককাল আন্দোলনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার হয়। কিন্তু এতে জারের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাশিয়া এই যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্র শক্তিবর্গের পক্ষে ও জার্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধারণ করে। কিন্তু রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বার বার পরাজয় ও অযোগ্য শাসন ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার জনসাধারণের দুর্ভোগ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। অসন্তোষ ও অভাব-অভিযোগের ফলে বড় বড় শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এই সময় রাশিয়াতে খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। যে সৈন্য বাহিনীর উপর নির্ভর করে জার তাঁর শাসনকার্য চালাতেন, তারাও খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে দলে দলে এসে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রুশ বিপ্লব শুরু হয়।



লেনিন

১৯১৭ সালের মার্চ-বিপ্লবের ফলে স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের পরিবর্তে একটি উদারপন্থী সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এই নতুন শাসনব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তার কারণ দেশের জনসাধারণের তখন কাম্য ছিল শান্তি, আহার ও বাসস্থানের। এর জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ বিরতির, জমিদারী উচ্ছেদ এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণের। আর তাছাড়া প্রয়োজন ছিল শিল্পপতিদের হাত থেকে সমস্ত কারখানা কেড়ে নিয়ে



ট্রটস্কি

শ্রমিকদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া। কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠিত মধ্যপন্থী সরকার এই বিপ্লবী নীতির বিরোধী ছিল এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

দেশের যে সব জায়গায় বিপ্লবী সোভিয়েত দল গড়ে উঠেছিল সে সব জায়গায় বলশেভিক নামে চরমপন্থী বিপ্লবীরা প্রাধান্য লাভ করল। বলশেভিক দলের লেনিনও এই সময় সুইজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। বলশেভিকরা তখন শান্তিস্থাপন, জমি-জমার পুনর্বণ্টন ও খাদ্য সরবরাহের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

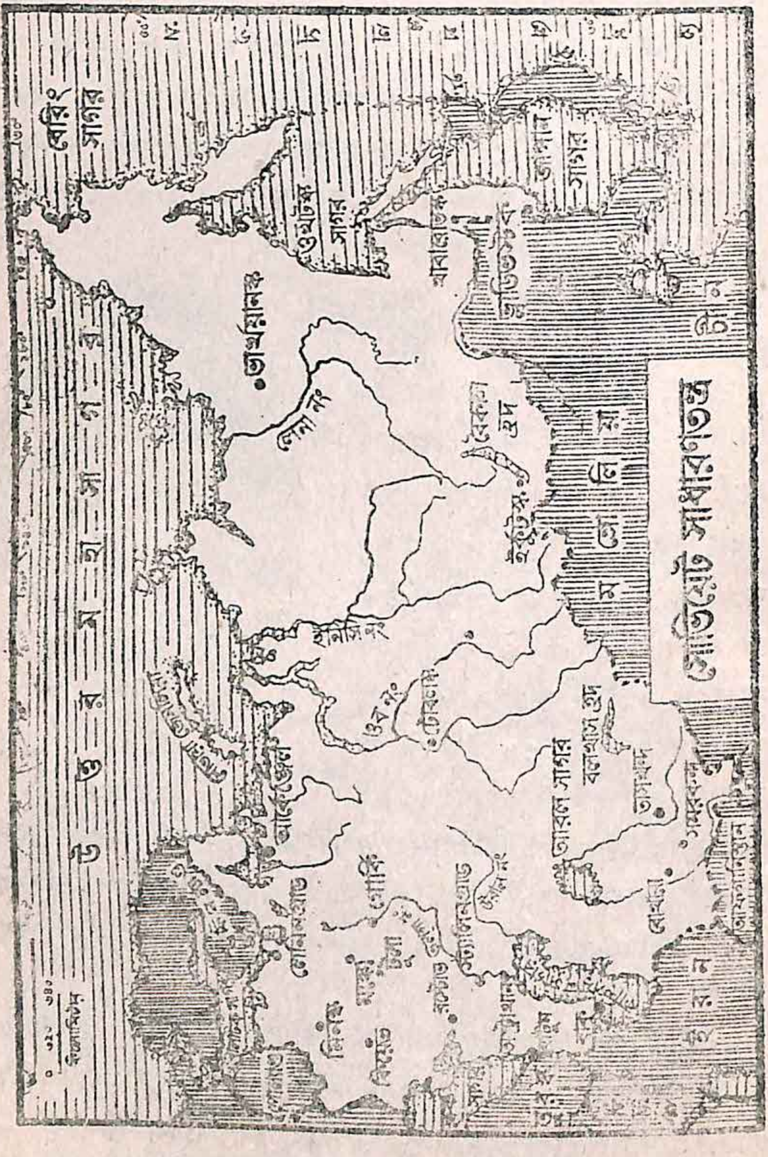


স্ট্যালিন

দেশ জুড়ে যখন এই অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন জার্মান সেনাবাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে পেট্রোগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই নতুন পরাজয়ের ফলে এবার দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এই সময় লেনিন তাঁর দুই সহযোগী ট্রটস্কি ও স্ট্যালিনের সাহায্যে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অধিকার করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ৭ই নভেম্বর বলশেভিক দলের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার বিপ্লব হয়। আজও ঐ দিনটিতে রুশেরা বিপ্লব দিবস হিসাবে পালন করে। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় বলশেভিকদের শাসনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কারণে প্রথম বিপ্লবের চেয়ে দ্বিতীয়টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপ ও পৃথিবীতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব : ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মত ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রুশ বিপ্লব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রভাব শুধু রাশিয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না— ইউরোপ এবং সমস্ত পৃথিবীতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। গতি প্রকৃতিও ফলাফলের কথা চিন্তা করলে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশ-বিপ্লবকে মহাবিপ্লব বলা চলে।

এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি হয়। বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে



পরিণত হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানিতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীতেও সাম্যবাদী আন্দোলন

শক্তিশালী হয়ে উঠে। পরে জার্মানিতে হিটলারের এবং ইটালীতে মুসোলিনীর আবির্ভাবের ফলে এই আন্দোলন প্রশমিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে ব্রিটেন ও ফ্রান্সেও সাম্যবাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে, তবে এই আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়।

এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্যবাদ ভালভাবে প্রসারলাভ করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বাকু শহরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের একটি সভা বসে। তাতে সাম্যবাদী উপায়ে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের কার্যক্রম আলোচিত হয়। এরপর মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ এবং ফিলিপাইন দীপপুঞ্জে সমাজবাদী গণ-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে কল-কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয় উপদ্বীপে সাম্যবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়ার মধ্যে চীনদেশে সাম্যবাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসারলাভ ঘটে। আজও পৃথিবীতে চীন ও রাশিয়া সাম্যবাদী দেশ হিসাবে অগ্রণী।

ইউরোপ, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়াতে সেভিয়েট বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণী সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া এইসব দেশ ছিল কৃষি নির্ভর। জমিদারী অত্যাচারও যথেষ্ট ছিল। সাম্যবাদ প্রধানতঃ কৃষকদের মধ্যেই প্রসারিত হয়। বহু অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যে থেকে সাম্যবাদ রোধ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এইসব দেশে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয়।

ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো, কিউবা, ইকোয়েডর, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদের গভীর প্রভাব পড়ে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের

নিকট রুশ বিপ্লব মুক্তির নতুন বার্তা বহন করে আনে। রুশ বিপ্লব একদিকে রাজনৈতিক বিপ্লব, অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লবের আগে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। সোভিয়েট বিপ্লবের পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়া একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার শতকরা আশি জনই ছিল কৃষক। বর্তমানে রাশিয়ার শতকরা নব্বই জনই শহর নগরের অধিবাসী। রাশিয়াতে নিরক্ষরতা নেই। কৃষি-কাজও যান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হয়।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মত জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রধানতঃ ইউরোপের অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রুশ-বিপ্লবের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম আধুনিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ অনুশীলনী ॥

● **মৌখিক প্রশ্ন :**

১. রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি কি ছিল ?

২. জার দ্বিতীয় নিকোলাস যেজাতীয় সভা স্থাপন করেন তার নাম কি ছিল ?

৩. 'বলশেভিক' কথাটির অর্থ কি ?

৪. কোন্ সালে রুশ বিপ্লব শুরু হয় ? দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব কখন হয় ?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তর- ধরনেরপ্রশ্ন :**

১. জারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কি অভিযোগ ছিল ?

২. বলশেভিক দলের আবির্ভাব কিভাবে হয় ? রুশ বিপ্লবকে 'বলশেভিক বিপ্লব' বলা হয় কেন ?

৩. লেনিন কে ছিলেন ? তিনি কোন্ মতবাদে বিশ্বাসী ? তিনি কিভাবে বিপ্লবের সহয়তা করেন ?

৪. কার্ল মার্কস কে ছিলেন ? রুশ বিপ্লবে তাঁর কি প্রভাব পড়েছিল ?

● **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. রুশ বিপ্লবের কারণ কি ছিল ?

২. রুশ বিপ্লবের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ দাও।

● **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :**

সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

১. রুশ বিপ্লব ঘটে ১৭২৭, ১৮১৭, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে।

২. রাশিয়ার বলশেভিক নেতা লেনিন, মার্কস, স্টালিন।

৩. রাশিয়ার শেষ জার-নিকোলাস, আলেকজাণ্ডার ট্রটস্কি।

১৪ | ইউরোপ (১৯১৯—১৯৩৯)

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্যারিস নগরীতে সমবেত হন। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে মিত্রশক্তিবর্গ পাঁচটি সন্ধির দ্বারা বিশ্বশান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হন। এই সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এই পাঁচটি সন্ধি হ'ল— জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই-এর সন্ধি, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি, হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়ানের সন্ধি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলিয়ের সন্ধি, তুরস্কের সঙ্গে সেভার্সের সন্ধি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইল্‌সন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড্ ল্যয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্‌শো ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো এই বৈঠকে প্রধান ভূমিকা নেন। এঁরা 'প্রধান চারজন' অর্থাৎ Bigfour নামে খ্যাত।

ভার্সাই-এর সন্ধির (১৯১৯ খ্রীঃ) শর্ত অনুসারে জার্মানী ফ্রান্সকে আল্‌সেস্-লোরেন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বেলজিয়ামকে ইউপের ও মামেডি এবং পোল্যাণ্ডকে পোজেনের অধিকাংশ অঞ্চল ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে বাধ্য হয়।

সেণ্ট জার্মেইন সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার টাইরল, ট্রিয়েষ্ট প্রভৃতি স্থান ইটালীকে অর্পন করা হয়। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া রাজ্য নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া গঠিত হয়। বসনিয়া ও হারজেগভিনা সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য গঠিত হয়।

নিউলির সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার একাংশ যুগোশ্লাভিয়াকে এবং থে্সের পশ্চিমাংশ গ্রীসকে অর্পণ করে। ট্রিয়ানের সন্ধিতে হাঙ্গেরী রুমানিয়াকে ট্রান্সিলভানিয়া, চেকোশ্লো-

ভয়াকিয়াকে শ্লোভাক অঞ্চল ও যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোয়েশিয়া অঞ্চল অর্পন করে। সেভার্সের ও লুজানের সন্ধি দ্বারা ইউরোপে কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া তুরস্কের আর বিশেষ কিছু রইল না তুরস্ক এশিয়ার একটি শক্তিরূপে পরিগণিত হল।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব

ইটালীতে ফ্যাসিবাদঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালীর যে স্বার্থনাশ হয়েছিল এবং ইটালীকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল সেই তুলনায় প্যারিসের শান্তি চুক্তি অনুসারে ইটালী অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। ফলে ইটালীয়দের মনে প্যারিস শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ইটালীয়দের মনের ভাব যখন এরূপ তখন যুদ্ধোত্তর সমস্যা প্রসূত অভাব-অনটন বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা এক ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবসমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।



বেনিটো মুসোলিনী

এই সময় সমাজতন্ত্রী দলের আবির্ভাব হয়। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল দেশের কলকারখানা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং আর্থিক দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই সরকার-বিরোধীদল ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠে। এই দলের নায়ক ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী। সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ ফেরত দুর্দশাগ্রস্ত সৈনিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন, এদের বলা হয় ফ্যাসিষ্ট।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট দল একরমক জোর করে ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করে। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং শাসনব্যবস্থায় সংহতি ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মুসোলিনির এই ফ্যাসিষ্টদল কতকগুলি বিষয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করে সত্যি কিন্তু এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বিকার করা অথবা আর্থিক দিক থেকে ধনবণ্টন ব্যবস্থার দ্বারা সাম্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল। ইটালীর জনসাধারণ সমাজ-তন্ত্রীদলের কর্মপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা দলে দলে মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট দলে যোগ দেয়।

এদিকে ইটালীর সরকারের দুর্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রীসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু মুসোলিনী এভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ-গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইটালীর সরকারকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। তাই ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুসোলিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান চালনা করেন। ইটালীর সরকার ভয়ে পদত্যাগ করেন। মুসোলিনি বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা লাভ করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। পার্লামেণ্ট বিনা বাধায় তাঁর হাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলে ইটালীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

শাসনভার গ্রহণ করার পরেই মুসোলিনি দেশে অরাজকতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

মুসোলিনির শাসনকালে ইটালী ও ফ্রান্সের কূটনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া অধিকার করে, এবং আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলও অধিকার করে। মুসোলিনির পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপে রাজ্য বিস্তার এবং সেই অঞ্চলে ইটালীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলে ইটালী ও জার্মানি একযোগে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করে। ১৯৩৯

খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হলে ইটালী ও জার্মানী জাপানের সঙ্গে ও ফ্রান্স মিত্র শক্তির সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়।

জার্মানীতে নাৎসী দলের উদ্ভব ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী দেশকে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা যেভাবে অবনমিত করবার চেষ্টা করা হয় তা আত্মমর্যাদাশীল জার্মান জাতীর নিকট এক দারুন অপমান, অন্যায় ও অবিচারের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া এক অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবার ভার জার্মানীর উপর চাপিয়ে জার্মানিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিরকালের মত পঙ্গু করবার চেষ্টা করা হয়। একেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির আভ্যন্তরীন অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, উপরন্ত মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানীর উপর যে ঋণের বোঝা চাপানো হয় তা জার্মানির পক্ষে ক্রমশঃ দুর্বিসহ হয়ে উঠে। জার্মানদের মধ্যে স্বভাবতই ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিজেতা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হিটলারের নেতৃত্বে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট বা নাৎসীদল জার্মানীতে গড়ে উঠে।



হিটলার

ক্ষমতা লাভের পর একে একে ভার্সাই শর্তাবলী অমান্য করতে থাকেন। তিনি জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং প্রত্যেক যুবককেই যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ করে তোলেন। জার্মানির শিল্পাঞ্চলগুলিতে তিনি বহু কলকারখানা স্থাপন করেন এবং দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ করে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা এমনভাবে পুনর্গঠন করেন যাতে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তাবলী প্রতিরোধ করে জার্মান প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনা। দেশকে সব বিষয়ে শক্তিশালী করবার পর হিটলার দাবী করলেন যে, জার্মানির বাইরে যে সব অঞ্চলে জার্মানদের বাস ছিল সেগুলি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি জার্মানিকে পুনরায় সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যোগ দেননি। তিনি লীগ অব নেশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

জার্মান হিটলালের নেতৃত্বে ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করে রাইন নদীর তীরে আন্তর্জাতিকভাবে নিরস্ত্রকৃত স্থান দখল করে নেয়। ইটালীর সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে জার্মানি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। স্পেনের অন্তদ্বন্দ্বে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে জার্মানি ও ইটালী সাহায্য দান করে জয়যুক্ত করে। তারপর হিটলার প্রথমে অষ্ট্রিয়া দখল করেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকবার ফলে হিটলারের আকাঙ্খা ও ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যাণ্ড স্থানটি তিনি দাবী করেন। মিউনিক চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হিটলারের দাবী স্বীকার করে নেয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে হিটলার জাপানের সঙ্গে কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ইটালী জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে যোগ দিলে রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রীসংঘ স্থাপিত হয়। এর পর হিটলার ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স অন্যান্য রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগে লিথুয়ানিয়ার কাছ থেকে মেমেল বন্দর অধিকার করেন। কিন্তু এতেও তাঁর সন্তুষ্টি হয়নি। তাঁর দৃষ্টি পড়ে পোল্যাণ্ডের উপর। হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট ডান্‌জিগ শহরটি দাবি করলে ইংলণ্ড, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স হিটলারকে বাধা দেবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া হিটলারের অগ্রগতিতে শঙ্কিত হয়ে জার্মানির সঙ্গে 'অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এতে হিটলারের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোলিশ করিডর অধিকারের ইচ্ছায় হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

বস্তুতঃ ভার্সাই এর শান্তি চুক্তিতে জার্মনির প্রতি যে অবিচার করা হয় তার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

জাতিসঙ্ঘ-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে সকলেই যুদ্ধবিগ্রহের কুফল বুঝতে পারেন। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ যুদ্ধ আর না ঘটতে পারে সেজন্য সকলেই সচেষ্ট হয়ে উঠেন। শান্তির জন্য এই ব্যাপক আকাঙ্খা থেকেই ভার্সাই সন্ধির সময়ে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতিসঙ্ঘ বা লীগ-অব্-নেশনস্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উড্রোউইলসন এই সঙ্ঘটি গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে এই জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন বসত। যুদ্ধে বিজয়ী এবং নিরপেক্ষ কতকগুলি রাষ্ট্র প্রথমে এই সঙ্ঘে যোগ দেয়। পরে পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকেও সভ্য হবার অনুমতি দেওয়া হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসনের প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই জাতিসঙ্ঘে যোগ দেয়নি।

লীগ্-অব্ নেশনস্ এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা। যুদ্ধের পরিবর্তে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যেই জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে হেগ আদালতে তার বিচার হ'ত।

জাতি-সঙ্ঘ কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের অন্তবর্তীকালে লীগ অব্ নেশন্স্ আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট ছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আধিপত্যনিয়ে বিরোধ দেখা দিলে জাতিসংঙ্ঘ-এর মীমাংসা করে।

তুরস্ক ও ইরাকের বিবাদে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মধ্যস্থতা করেছিল। লীগের চেষ্টায় এই দুই দেশের সীমা নির্ধারিত হয়েছিল।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রায়ই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটত। ১৯৫৩ গ্রীস্টাব্দে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী বুলগেরিয়ায় নিহত হলে গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। এই বিষয়টি পরে জাতিসঙ্ঘে উত্থাপিত হয় এবং গ্রীসকে সৈন্য অপসারণ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে জাতিসঙ্ঘ দু'দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। উপরোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে জাতিসঙ্ঘ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবতার ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ কৃতিত্ব অর্জন করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারেও জাতি-সঙ্ঘের অবদান ছিল।

উপরিউক্ত কার্যকারিতা সত্ত্বেও নানা প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলেই এই লীগের পতন ঘটেছিল। যে কারণে লীগ-অব্ নেশন্স্ বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।

আসলে জাতিসঙ্ঘের সূচনা অত্যন্ত অশুভ ছিল। সংগঠনের দিক থেকে লীগের উপর পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির আস্থা ভাজন ছিল না। কারণ আমেরিকা, রাশিয়া- এরা সদস্যভুক্ত ছিল না। ফ্রান্সের দাবী অনুসারে পরাজিত জার্মানিকে প্রথমে জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি। পরে জার্মানিকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে জাপান ও জার্মানি লীগ ত্যাগ করে। জাতিসঙ্ঘ অনেকগুলি ছোটখাটো আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়েছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়নি। তার কারণ

ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগলেই বড় বড় দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি মানতে অস্বীকার করত। তাদের উপর জাতিসঙ্ঘ জোর খাটাতে পারত না। জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে প্রত্যেক দেশই জাতীয় স্বার্থকেই প্রথম স্থান দিত। লীগের কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলছিল। এই লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও সেজন্য তেমনভাবে কোন দেশই উপলব্ধি করেনি। ফলে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে জাপান যখন চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অন্যায়ভাবে অধিকার করে ও ইটালী আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করে তখন জাতিসঙ্ঘের সেনাবাহিনী না থাকায় এদের কাউকে রোধ করতে পারেনি। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে জার্মানি পুলিস করিডর আক্রমণ করে এবং তখন থেকেই জাতিসঙ্ঘ ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এর বিলোপ ঘটে।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন :

১. কোন্ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ?

২. প্যারিস সম্মেলনে মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির সঙ্গে কোন সন্ধি সাক্ষর করে ?

৩. জার্মানীতে নাৎসী দল কার নেতৃত্বে গড়ে উঠে ?

৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কার প্রচেষ্টায় জাতিসঙ্ঘ গড়ে উঠে ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন :

১. ভার্সাই সন্ধির শর্ত কি ছিল ?

২. ইটালিতে মুসোলিনির অভ্যুত্থান কেন সম্ভব হয় ?

৩. হিটলার কিভাবে জার্মানির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. 'ভার্সাই সন্ধিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল'—তাৎপর্যটি আলোচনা কর।

২. কোন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসোলিনী ইটালীর সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন ? তিনি ও তাঁর দল দেশের জন্য কি করেছিলেন ?

৩. কিভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ? এর ব্যর্থতার কারণ কি ?

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হয় তারই প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রধানত জার্মানিকে দায়ী করা হয়। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর জার্মানিতে আবার যুদ্ধের উন্মাদনা দেখা দেয়।

হিটলার ক্ষমতালাভের পর ভার্সাই সন্ধির শর্ত অমান্য করে জার্মানিকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠন, নৌ-বাহিনী সুসজ্জিত করা এবং উপনিবেশ পুনপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন। তাছাড়া তিনি ক্ষতিপূরণ দেবার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করেন। সেই টাকায় হিটলার নানা বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

জার্মানি ভার্সাই সন্ধির শর্ত অমান্য করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরী করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জার্মানি ভার্সাই সন্ধি উপেক্ষা করে রাইনল্যাণ্ড দখল করে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মান সেনাবাহিনী অষ্ট্রিয়া দখল করে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন স্থানটি আক্রমণ করে। জার্মানি দাবী করে যে রাইনল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন জার্মানি প্রাধান স্থান, সুতরাং এই স্থানগুলি অধিকার করার দাবী জার্মানির আছে।

ইতিমধ্যে ইটালীর সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে জার্মানি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। এরপর থেকে জার্মানি ও ইটালী অস্ত্রসজ্জা ও আক্রমণের পথ বেছে নেওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর হয়ে উঠে।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইটালী অত্যন্ত অন্যায়ভাবে উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। ঠিক ঐ সময়ে হিটলার ও মুসোলিনীর পথ অনুসরণ করে, জাপান অস্ত্রসজ্জায় মেতে

উঠে। জাপান ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে চীন আক্রমণ করে। জার্মানী, ইটালী ও জাপান যখন এভাবে একটির পর একটি আক্রমণাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে চলে ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে। উপরন্তু তারা জার্মানি, ইটালী ও জাপানের সঙ্গে আপোষ করে চলতে চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে মিউনিক শহরে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন এবং হিটলার ও চেম্বারলেনের মধ্যে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে হিটলারের আগের কাজগুলি মেনে নেওয়া হয়। চেম্বারলেনের তোষণ নীতি এভাবে হিটলারের আক্রমাণাত্মক কাজের সহায়ক হয়ে উঠে। এভাবে ক্রমশঃ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যাণ্ড অধিকার করে নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্ব—এই দুই-এর পরস্পর আদর্শগত দ্বন্দ্ব। স্পেনের অন্তযুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের পরাজয় এবং জার্মানি ও ইটালীর সহায়তায় জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ পক্ষান্তরে অক্ষশক্তিবর্গের প্রসারনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সও বৃটেনের সঙ্গে যোগ দেয়। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় ছ'বছর ধরে চলে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এইযুদ্ধে জাপান, জার্মানি ও ইটালী পরাজিত হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলেও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়নি। যুদ্ধ শেষ হবার পরই বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে কতকগুলির নতুন সমস্যা ও তাই নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। এইসব সমস্যাগুলির কোন সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি দু'ভাগে মোটামুটি বিভক্ত হয়। একদল হ'ল রাশিয়া ও কয়েকটি সাম্যবাদী সমাজ-তান্ত্রিক

রাষ্ট্র ; যথা, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও পূর্ব জার্মানি এবং অন্যদল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও তাদের মিত্রগণ।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। মস্কো থেকে পূর্ব বার্লিন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে মার্কসবাদী আদর্শে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রগুলি হ'ল— রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল জার্মানির ঐক্য সাধনের সমস্যা। আজ পর্যন্ত জার্মানির একাংশ পূর্ব জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। জার্মানির এই অংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রভাব হ্রাস পায়। অপর দিকে আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসাবে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করে।

জাপানকে পরাজয়ের পর আমেরিকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একাধিপত্য বিস্তারে চেষ্টা করে। আমেরিকার এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা সৃষ্টি করে রাশিয়া। সোভিয়েট রাশিয়া এই সময়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন চলে তার জয় কামনা করে। তাই সোভিয়েট রাশিয়া চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি, ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহ এবং হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির জন্য স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করে।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন :

১. কত সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ?

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ কোন দেশকে দায়ী করা হয় ?

৩. হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে কবে ?
৪. দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের ফলে কোন দেশ ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয় ?
৫. কোন্ দেশ ধণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে ?

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী দেশগুলি জার্মানীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?
২. জার্মানীকে শক্তিশালী করার জন্য হিটলার কি করেছিলেন ?
৩. চেম্বারলেনের সঙ্গে হিটলারের কি চুক্তি হয় এবং কেন ?
৪, রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর কি উদ্দেশ্যে চুক্তি সাক্ষরিত হয় ? এই চুক্তিতে জার্মানীর কি কোন সুবিধা হয় ?
৫. কোন্ সালে এবং কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন্ দেশ কোন্ পক্ষে ছিল ?

● রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি ছিল ? এই মহাযুদ্ধের জন্য কাকে দায়ী করা হয় এবং কেন ? দ্বিতীও বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর— এর শান্তি চুক্তিতে — প্রতি, যে অবিচার করা হয় তারই ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব।
২. — অভুত্থানের পর — আবার যুদ্ধের উন্মাদনা দেখা দেয়।
৩. ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী — ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে — শহরে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন।
৪. রাশিয়া এই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে — সঙ্গে একটি — চুক্তি স্বাক্ষর করে।
৫. — খ্রীস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর — পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

১৬ | ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭)

● প্রথম পরিচ্ছেদ ●

অসহযোগ আন্দোলনঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় শুরু। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। এই বছরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল অহিংস ও অসহযোগ। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর স্বরাজ লাভ। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন বহু নির্দোষ ভারতবাসী নিহত ও পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রয়োগ হয় তখন গান্ধীজী আন্দোলনের পথ বেছে নেন। এই সময় ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করলে; গান্ধীজী মুসলমানদের সহযোগ পাবার আশায় অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন।

গান্ধীজী বলেন যে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ দু'টি লক্ষ্য নিয়ে চালিত হবে। প্রথম স্বরাজ লাভ ও দ্বিতীয় অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করা। অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(১) সরকারী খেতাব বর্জন (২) সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন (৩) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বর্জন (৪) ইংরেজদের আদালত বর্জন (৫) বিলেতী কাপড় ও দ্রব্য বর্জন (৬) জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা। (৭) আইন সভার সদস্যপদ বর্জন।



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর ডাকে দেশবাসী অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহন করে' জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্র বসুও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইংরেজ সরকার গুলি ও লাঠির সাহায্যে অহিংস জনতাকে শায়েস্তা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। শেষে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চৌরীচৌরা নামে এক থানায় আন্দোলনকারীরা আগুন লাগিয়ে কয়েকজন পুলিশকে পুড়িয়ে মারায় গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

কৃষক শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঃ ভারতে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হলে শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে সংগঠিতভাবে কোন শ্রমিক আন্দোলন হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকগণের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে শ্রমিক সংগঠন গঠিত হলে ভারতে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়। আমেদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শ্রমিকগণ কাপড়ের কলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক দল স্থাপিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকেনি। জাতীয় কংগ্রেস কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ না করে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এইভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠে।

ভারতীয় কৃষকশ্রেণী ইংরেজ আমলে নানাভাবে শোষিত ও

নির্যাতিত হয়। মহাত্মা গান্ধী চম্পারণে নীলকরগণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে চম্পারণ সত্যাগ্রহ করে সাফল্য লাভ করেন। গুজরাটের খয়রা জেলায় সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কৃষকগণের পক্ষ নিয়ে তিনি কর বন্ধ আন্দোলন করে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলীতে কৃষকগণের পক্ষ নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত কিষাণ সভা স্থাপিত হলে কৃষক সংগঠন জোরদার হয়।

ভরতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠলে বৃটিশ সরকার দমন নীতির প্রয়োগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারত রক্ষা আইন দ্বারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোনকে দমিয়ে ফেলা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে জাতীয় আন্দোলন বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে। ফলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়।

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

আইন আমান্য আন্দোলন

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের লোকের অসন্তোষ বেড়েই চলে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে মোতিলাল নেহেরু বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নেতাগণ মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের জন্য একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করেন। ইংরেজ সরকার কিন্তু মোতিলাল নেহেরুর রিপোর্ট অনুসারে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিতে অসম্মত হন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে স্থির হয়, এক বছরের মধ্যে সরকার ডোমিনিয়ন স্টেট্যাস ভারতীয়দের না দিলে পূর্ণ স্বরাজ দাবী করা হবে। লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাট হয়ে (১৯২৯ খ্রীঃ) এসে ভারতকে ডেমিনিয়ন স্টেট্যাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রাখেননি। ফলে কংগ্রেস নেতাদের মনে

গভীর অসন্তোষ জাগে এবং ইংরেজ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠে। এই সময় দেশের সর্বত্র আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি থাকায় আইন অমান্য আন্দোলন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

এদিকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রিতে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনের সূচনা করেন। যতদিন না জাতি স্বাধীনতা লাভ করে ততদিন প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করার সংকল্প নেওয়া হয়। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায় এই আন্দোলন চলবে এবং পূর্ণ স্বরাজলাভ এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

এইভাবে এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। গান্ধীজী সর্বপ্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সবরমতি আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে গুজরাটের সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করতে পদযাত্রা করেন। ইতিহাসে এই অভিযান 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে খ্যাত। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লবণ আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজী আন্দোলনের সূচনা করেন। সে সময়ে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করা দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর অনুচরেরা ইংরেজদের এই লবন আইন অমান্য করার ফলে ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বোম্বাই, বাংলাদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বে-আইনী লবণ তৈরী হতে থাকে। যে সব



জওহর লাল নেহরু

স্থানে লবণ তৈরী সম্ভব ছিল না, সেখানে আবগারী দোকান, বিদেশী কাপড় ও ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর দোকানে গান্ধীজীর নির্দেশে মহিলারা পিকেটিং শুরু করেন। সরকার বর্বর অত্যাচার করলেও জনতা অহিংস-ভাবে আন্দোলন চালায়। মোটের উপর এই অহিংস আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খান আবদুল গফুরখানের নেতৃত্বে খোদাই খিদমৎগার নামে লাল কোর্তা পরা পাঠান স্বেচ্ছাসেবকগণ অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড পুলিশ নির্যাতনেও তারা শান্ত থাকে। গান্ধীজীর অহিংস নীতি গফুর খাঁর খুব আস্থা ছিল। তিনি সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল পুলিশ পেশোয়ারে গুলি চালিয়ে কয়েক'শ ব্যক্তিকে আহত ও হত্যা করে। ১৬ই এপ্রিল জওহরলাল নেহেরু এবং ৫ই মে গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন। গান্ধীজী কারারুদ্ধ হলে এই আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করে। আন্দোলন আরও ছয় মাস কাল চলেছিল। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের পর আন্দোলনের অবসান হয়। যদিও এই চুক্তি অনুসারে সরকার সব রকম দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন কিন্তু দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের শেষে ভারতে ফিরে গান্ধীজী দেখলেন যে সরকার এই চুক্তির শর্তাদি কাজে রূপায়িত করতে যত্নবান নন। ফলে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে বাধ্য হন। অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আরও প্রায় ছয় মাসকাল আন্দোলন চলার পর ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের অবসান হয়।



খান আবদুল গফুরখান

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

ভারত ছাড় আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে দেশ রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অসম্মত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৮ই আগষ্ট বোম্বাইতে ইংরেজদের ভারত ত্যাগের আদেশ দেয়। কংগ্রেস কার্য নির্বাহক সমিতিও বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির এক বক্তৃতায় গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং জনসাধারণকে নাশকতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন।



কিন্তু আন্দোলন শুরু হবার আগেই সরকার পক্ষ গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের বন্দী করে। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে উত্থিত হয় 'ভারত ছাড়' ধ্বনি। দেশের জনগণ জনসভায় সমবেত হয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনা করে। দেশের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। এই আন্দোলনে ছাত্ররা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উৎপীড়ন, গোলাগুলি ও অত্যাচারের সাহায্যে এই বিদ্রোহ অতি কঠোরভাবে

দমন করে। এই আন্দোলনে বাংলার মেদিনীপুর জেলার জনগণ এক অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন। মেদিনীপুরে ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা দৃঢ়ভাবে ধরে পুলিসের গুলিতে আত্মাহুতি দেন।

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ বহু জায়গায় লুঠতরাজে লিপ্ত হয়ে রেলষ্টেশন ডাকঘর ও থানা আক্রমণ করে। কারাগারে গান্ধীজী জনসাধারণের কার্যকলাপে অনুতপ্ত হয়ে অনশন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত বন্দী অবস্থায় গান্ধীজী অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ৬ই মে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

● চতুর্থ পরিচ্ছেদ ●

আজাদ হিন্দ্ ও গণমনে এর প্রতিক্রিয়া

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে মারাত্মক বিপ্লবীরূপে চিহ্নিত করে প্রথমে কারাগারে এবং পরে নিজের বাড়ীতে অন্তরিণ রাখে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গোপনে কলিকাতা থেকে বের হয়ে (১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ খ্রীঃ) আফগানিস্তান ও রাশিয়ার ভিতর দিয়ে জার্মানিতে পৌঁছান। ইংরেজদের শত্রু হিটলার সুভাষচন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করেন। জার্মানির হাতে বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে সুভাষচন্দ্র হিটলারের অনুমতিক্রমে দু'টি সেনাদল গঠন করেন। জার্মানির ভারতীয় সম্প্রদায় সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' আখ্যা দেয়।


নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ইতিমধ্যে জাপান বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার ফলে মিত্রশক্তির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। দ্রুতগতিতে জাপান মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দখল করতে থাকে। এই সময় ভারতের অন্যতম বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রবাসী ভারতবাসীদের সাহায্যে স্বাধীন

ভারতের পরিকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৪০,০০০ হাজার যুদ্ধ বন্দী নিয়ে গঠন করেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। তখন ব্যাংককে একটি সমাবেশে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা এবং এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ১৩ই জুন সুভাষচন্দ্র টোকিওতে উপস্থিত হন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত রকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হলে এক বিশাল জনতা তাঁকে দেশমাতৃকার মুক্তিদাতারূপে অভিহিত করেন। এখানেই ৪ঠা জুলাই রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন। বিশাল জনতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলে অভিনন্দিত করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ২১শে অক্টোবর নেতাজী সিঙ্গাপুরে ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, মণিপুরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ। জাপানের সহযোগিতায়, নিজেদের উদ্যোগে এবং নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যায় অবিরত সংগ্রাম। কিন্তু ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা আবার শক্তি সঞ্চয় করলে জাপান স্বদেশ রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়। ফলে জাপান আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে যথোপযুক্ত সাহায্য করতে পারেনি। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সর্বস্ব পণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও তাদের ইম্ফল ও কোহিমা অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে আগষ্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পন করলে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের অবসান হয়। সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে বিমানে চেপে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আজও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াঃ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জনপ্রিয়তা, দেশের স্বাধীনতা লাভ যে ত্বরান্বিত করে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকেরা উপযুক্ত খাদ্য এবং পর্যাপ্ত বেতনের দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করে এবং এই উপলক্ষে বোম্বাই শহরে প্রবল

গোলযোগ দেখা দেয়। এর প্রতিক্রিয়া করাচী, মাদ্রাজ ও কলকাতাতেও অনুভূত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে শেষ হলেও ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীন করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। কিন্তু রক্ষণশীল দল সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়।



মহম্মদ আলি জিন্না

ইংলণ্ডের জনমতও এই নীতি সমর্থন করে। রক্ষণশীল সরকারের নির্দেশে ঐ সময় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষে আসেন এবং তিনি স্থির করেন যে ভারতীয়দের দ্বারা শাসনযন্ত্র রচনা না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তবর্তী সরকার গঠন করবেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়াভেল সিমলায় একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান দাবি ত্যাগ না করার ফলে এই বৈঠক ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে ক্লামেণ্ট এট্‌লা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। এট্‌লি উদার মনোভাব নিয়ে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কৃতসংকল্প হন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডে কমন্সসভায় এক বিবৃতিতে তিনি ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে ইংরেজ সরকার ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করবেন। ঘোষণা অনুযায়ী তিন জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি দল মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে ভারতে আসেন। ক্যাবিনেট মিশনের মন্ত্রীসভার এই তিন জন সদস্য ভারতে এসে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপরিকল্পনা দেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ ঐক্যমতে আসতে পারেনি। জিন্নার দাবি 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র। মন্ত্রীমিশন এই দাবী অগ্রাহ্য করলে মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র দ্বারা পাকিস্তান গঠনে সচেষ্ট হয়। লীগের এই

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ফলে পাঞ্জাব, কলকাতা, পূর্ববঙ্গ ও বিহারে বহু জীবন নাশ ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

● পঞ্চম পরিচ্ছেদ ●

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ

মুসলিম লীগ জিন্নার নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অরাজকতা শুরু হয়। মন্ত্রীমিশন এই অবস্থায় একটি বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাঁরা গণপরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন এবং যতদিন পর্যন্ত নতুন সংবিধান প্রস্তুত না হয় ততদিনের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের নেতৃত্বে একটি 'অন্তবর্তী সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারটি গঠিত হয়।

মুসলিম লীগের সদস্য ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবার ফলে লীগ বিক্ষুব্ধ হয়। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে লীগের সদস্যরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন বটে কিন্তু নেহরুকে নেতা হিসাবে মানতে রাজী হননি। লীগ সদস্যের নেতা ছিলেন লিয়াকত আলি খান। এদিকে জিন্না পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান সভা দাবি করতে থাকেন এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও চলতে থাকে।

দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্লী বুঝতে পারেন মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এট্লী ঘোষণা করেন ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন। এতে মুসলিম লীগ আরও অসন্তুষ্ট হয়। ফলে লীগ পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করে। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে নতুন বড়লাট নিযুক্ত করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তাঁকে ভারতে পাঠান। ভারতের গভর্ণর জেনারেল রূপে এসে মাউন্টব্যাটেন দেখেন যে

ইতিমধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীতে মুসলিম লীগ আসাম, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করেছে। মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন যে এই পরিস্থিতিতে দেশ বিভাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। ভারতবর্ষকে ভাগ করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হয়।



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ করলে ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

॥ অনুশীলনী ॥

● **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১. অসহযোগ আন্দোলনের নেতা কে ?
২. ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোন্ সালে স্থাপিত হয় ?
৩. কোন সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ?
৪. লবণ আইন ভঙ্গের নেতা কে ছিলেন ?
৫. ইংরেজদের ভারত ত্যাগের নির্দেশ প্রথম কে দেন ?
৬. আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ?
৭. কোন সালে নেতাজী সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন ?
৮. ভারত কবে স্বাধীন হয় ?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১. অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি ও কর্মসূচী কি ?
২. ভারত ছাড় আন্দোলন বলতে কি বোঝ ?

৩. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কি অবদান ?

৪. ব্রিটিশ সরকার কেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হয় ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. ভারত ছাড় আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা কি ছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ছিলেন —।

খ. স্বাধীনতালাভের ফলে ভারতবর্ষের বুকে সৃষ্টি হয় —— ও—নামে দুটি দেশ।

গ. —মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শ্রমিকগণ কাপড়ের কলে সত্যাগ্রহ আন্দালন করে।

২. যেটি যার সঙ্গে জুড়লে সম্পর্ক নির্ণয় হয় সেইভাবে সাজাও ঃ

সীমান্ত গান্ধী	ডাণ্ডি অভিযান
মহাত্মা গান্ধী	আজাদ হিন্দ্ বাহিনী
সুভাষচন্দ্র	খোদাই খিদমৎগার

১৭ চীনের বিপ্লব (১৯১১–১৯৪৯)

• প্রথম পরিচ্ছেদ •

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে চীনের জাতীয়তাবাদীরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সান-ইয়াৎ-সেনের অনুমতিক্রমে সমর-অধিনায়ক ইউ-য়ান-সিকাই চীনের রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করেন। বিদেশীরা তাঁকে চীনের বলবান মানুষ নামে আখ্যা দিয়েছিল। ইউ-য়ান-সিকাই সান-ইয়াৎ-সেনের মতের বিরোধী ছিলেন। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইউ-য়ান সিকাই কয়েকজন সামরিক নেতাকে অপসারিত করে নিজের মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। ফলে সান-ইয়াৎ-সেনের সমর্থনকারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইউ-য়ান-সিকাই অবশ্য সহজে এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। এরপর তিনি সান-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিন্‌-তাং দলের সদস্যদের পার্লামেণ্ট থেকে বিতাড়িত করেন (১৯১৩ খ্রীঃ) এবং কিছুকাল পর পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেন। আসলে ইউ-য়ান-সিকাই চীনে সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে চীনের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইউ-য়ান-সিকাই-এর অপসারণ দাবী করে। পরম দুশ্চিন্তার মধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্য ইউ-য়ান ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইউ-য়ান-সিকাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর সমর্থনকারীরা একজোট হয়ে চীনের উত্তরাঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে একটি সংসদ গঠন করে। এই সংসদের নাম তু-চুনদের (সমর নেতাদের) পার্লামেণ্ট। এই সময় চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে, সমর-নেতারা স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠে। তারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহও শুরু করে দেয়।

কুয়োমিন্‌-তাং দল (জাতীয়তাবাদী দল): সমর নেতাদের

অত্যাচারে সান-ইয়াৎ-সেনের প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিন্-তাং দল দক্ষিণ চীনকে তাদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। এই দল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীন বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের উত্তরাধিকারী চিয়াং কাইশেক রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে উত্তরে নানকিং পর্যন্ত দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কুয়োমিন্-তাং দল একটি সফল সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে একটি শাসনতন্ত্র গঠন করে।


চিয়াং-কাইশেক

কুয়োমিন্-তাং দল সাফল্যের সঙ্গে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই দল তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় এবং ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে এরা নানারকম দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। ১৯৪৫-৪৮ খ্রীঃ-এর চীনের গৃহ-যুদ্ধে কমিউনিস্টরা কুয়োমিন্ তাংদের পরাজিত করে।

সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ও তার তিনটি মৌলিক নীতি : ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ক্যান্টনে সান- ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু দেশের ঐক্য সাধনে তিনি তেমন সাফল্যলাভ করেননি।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে দেশের ঐক্য সাধন উদ্দেশ্যে তিনি চ্যাং-সো-লিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আলোচনার পূর্বেই অসুস্থাবস্থায় পিকিং নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কয়েকখানা বই লিখে রেখে গেছেন জাতির কর্মসূচী বর্ণনা করে এবং একটি 'শেষ উইল'-ও রেখে যান। গ্রন্থগুলি এবং উইলের মর্ম কুয়োমিন্-তাং সর্বতোভাবে গ্রহণ করে। গ্রন্থ তিনটি গণনীতি নামে পার্টির নীতি-শাস্ত্ররূপে গৃহীত হয়। এই তিনটি নীতি হ'ল—(১) জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত এবং জনসাধাণের জন্য প্রশাসন (গণতন্ত্র) (২) সর্ব-সাধারণের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা (সমাজতন্ত্র),. (৩) বিদেশী নিয়মতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি (জাতীয়তা)।

চীনে কুয়োমিন্ তাং ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক (১৯২১-২৪) : ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির আবির্ভাব ঘটে। ঐ বছরই সান-ইয়াৎ-সেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হয়ে রুশ সাহায্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি রুশ কমিউনিজমের মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেননি।

কুয়োমিন-তাং দলের প্রয়োজন ছিল রুশ সহযোগিতা, কারণ কমিউনিস্টদের দল গঠিত হয় বুর্জোয়া ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়ে। চাষী ও শ্রমিকদের উপর এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের তেমন প্রভাব ছিল না, চীনে কমিউনিজমের আবির্ভাব বিদেশী শক্তিবর্গের উদ্বেগের কারণ হয়। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ছিল সমর নায়কদের উচ্ছেদ ও জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি।

কুয়োমিন-তাং দলের দমনমূলক নীতি : ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্টরা সংহাই নামে শহরে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক জাপানী ফ্যাক্টরীতে দাঙ্গা বাধায়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্টরা ধর্মঘটে সাফল্য লাভ করে। এই সময় কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন একদল সৈন্য নানকিং অধিকার করে বিদেশীদের নির্যাতন শুরু করে।

চিয়াং-কাইশেক ছিলেন নরমপন্থী। কমিউনিস্টদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিচলিত হয়ে কমিউনিস্ট দমনে প্রবৃত্ত হন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ১২ই এপ্রিল কুয়োমিন-তাং বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে কমিউনিস্ট দল বিধ্বস্ত হয়।

উত্তর-পশ্চিম-চীনে কমিউনিস্টদের ৬০০০ মাইল দীর্ঘ অভিযান : মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা কিয়াংসি প্রদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু কুয়োমিন্-তাং বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তারা কিয়াংসি ছেড়ে ছয় হাজার মাইল দূরবর্তী পীত নদীর বাঁকে অবস্থিত সেন্‌সি প্রদেশে সরে আসতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্টদের ছয় হাজার মাইলের এই দীর্ঘ পদযাত্রা ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

সিয়াং-ফু ঘটনা : ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ পদযাত্রার পর মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা সেন্‌সি প্রদেশে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। (১৯৩৪ খ্রীঃ)। সেই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল সিয়ান নগর। কুয়োমিন্-তাং দলের সেনানায়ক চাং-সিউ-লিয়াং যখন সৈন্যদের

নিয়ে উপস্থিত হন কমিউনিস্টরা তখন যুদ্ধ না করে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে কুয়োমিন্-তাং ও কমিউনিস্টদের যৌথভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

চিয়াং-কাইশেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রত্যাহার করেন এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে জাপানী আক্রমণ প্রত্যাহার করার সঙ্কল্প করেন (১৯৩৬ খ্রীঃ)। ফলে কুয়োমিন্-তাং দলের চিয়াং-কাইশেকের সঙ্গে কমিউনিস্ট দলের মাও-সে-তুং-এর মধ্যে ঐক্যমত গঠিত হয়।

চীনের উপর জাপানী আক্রমণ ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত ঃ ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে জাপান চীনের বিরুদ্ধে তাদের রেলপথ উড়িয়ে দেবার অভিযোগ আনে এবং এই অজুহাতে জাপান চীনের তিনটি পূর্ব-প্রদেশ অধিকার করে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। লীগ অব নেশনস্ জাপানকে সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার আদেশ দেয় কিন্তু জাপান ঔদ্ধত্যভরে সেই আদেশ অমান্য করে লীগ্ ছেড়ে বেরিয়ে আসে (১৯৩৩ খ্রীঃ)। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জাপানীরা সাংহাই অধিকার করে এবং এর কিছুকাল পর রাজধানী নানকিং অধিকার করে। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে জাপানীরা ক্যান্টন ও ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তারা ইয়াং-সি পার্বত্য অঞ্চলে আই-চিং স্থানটিও অধিকার করে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জাপানের এই আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিলীন হয়।

১৯৪৫ খ্রীঃ চীনের গৃহযুদ্ধের সূচনা ঃ চিয়াং চীন থেকে বিতাড়ির এবং মাও-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূ-খণ্ডের ঐক্য স্থাপন ঃ ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ ছিল কৃষক শ্রেণী। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট দলের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ, সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে বারো লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারনের ভার পড়ে মাও-সে-তুং-এর উপর।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে জাপানের পরাজয়ের পর কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিস্ট দলের আন্দোলন সফল হয়। সমগ্র চীন কমিউনিস্টদের অধিকারে আসে। জনগণ-তান্ত্রিক চীন-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। চিয়াং-কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। ফলে চীনে জাতিয়তা-বাদী দল চিরতরে বিলুপ্ত হয়, মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে কমিউনিস্ট দল পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতালাভ করে। দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে আজ চীন এক শক্তিশালী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।



মাও-সে-তুং

● দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ●

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের পর)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। সিংহল বাদে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রায় জাপানের অধিকারে চলে যায়। জাপানের প্রচণ্ড আঘাতে এই অঞ্চল থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ চুর্ণবিচুর্ণ হয়। জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের পর ইউরোপীয় শক্তিগুলি তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যখন সচেষ্ট তখন এই অঞ্চলের সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

ইন্দোচীন : ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইন্দোচীনে বিখ্যাত কমিউ-নিস্ট নেতা হো-চি-মীনের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়;

ইন্দোচীন ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান ফ্রান্সের অধিকার থেকে ইন্দোচীন দখল করে। জাপান আনামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাওদাইকে তাদের এই তাঁবেদার রাষ্ট্রের প্রধান করে। কিন্তু হো-চি-মিন এই সরকারকে মানতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েট্-মিন দল ইন্দোচীনে ভিয়েৎনাম নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করে।



হো-চি-মিন

এদিকে ফ্রান্স আমেরিকা থেকে সাহায্য নিয়ে পুনরায় ইন্দোচীনে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে ভিয়েট্-মিন দলের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স ইন্দোচীন ত্যাগ করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম করে অসামান্য সাফল্যতা লাভ করে ভিয়েৎনাম তাদের অন্যতম।

উত্তর ভিয়েৎনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠিত হয় কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আমেরিকার সাহায্য নিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সত্তর দশকের মধ্যভাগে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ব্রহ্মদেশ ঃ ১৯৪২-৪৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকারে ছিল। এই সময় অ্যান্টি কমরেডস্ নামক একদল জাতীয়তাবাদী বর্মী ব্রহ্মদেশের সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের সুযোগ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'অ্যান্টি' দলের নেতা আয়ুং সান একটি সরকার গঠনে সমর্থ হন এবং ইংরেজদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তার অধিকাংশ সদস্যসহ ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-এ নিহত হন। এর কিছুদিন পর ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয় এবং ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক উ-নু-র নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হয়।

মালয়েশিয়া ঃ ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট মালয় স্বাধীন হয়। মালয় উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, পেনাং, সারাওয়াক, সাবা প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। দেশের সামরিক ঘাঁটিগুলি ইংরেজদের ব্যবহার করতে দিয়ে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমান ইংরেজদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করেন। সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব থাকায় এই জায়গাটিকে পৃথক করা হয়েছিল এবং ইংরেজরা এই সামরিক ঘাঁটিটির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তার প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সিঙ্গাপুরকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হবে না স্থির হয়। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। নিরাপত্তার প্রশ্নটি আলোচিত হয় এবং ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। নতুন রাষ্ট্রে লি-কুয়ান-উই প্রধানমন্ত্রী হন। দীর্ঘকাল টেংকু সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মালয়ের মিলনের বিরোধী ছিলেন, কারণ সিঙ্গাপুরে প্রচুর চীনা অধিবাসী থাকায় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে চীনা গরিষ্ঠতা হওয়ার আশঙ্কা টেঙ্কুর ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্নিও ও সারওয়াক নিয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

ইন্দোনেশিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, নিউগিনির অধিকাংশ এবং নিকটবর্তী অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠিত। ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকারে ছিল। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে জাপানের অধিকারে আসে এবং এখানে ইউরোপের শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণের নেতৃত্বে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ওলন্দাজগণ এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে অসম্মত হলে ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপিত হলে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে


সুকর্ণ

নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ওলন্দাজ সরকার তার নীতি পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে ওলন্দাজ ও জাতীয় সরকারের মধ্যে এক মীমাংসা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। এরপর থেকে ইন্দোনেশিয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

● তৃতীয় পরিচ্ছেদ ●

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ, অতলান্তিক সনদ: ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৯ই হইতে ১২ই আগষ্ট পর্যন্ত রুজভেল্ট ও চার্চিল কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হয়ে বিশ্বযুদ্ধোত্তর মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করেন। এইগুলি চার্টার বা **সনদ** নামে পরিচিত। এর মূল শর্তগুলি ছিল (১) আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলিকে নিরস্ত্র করা হবে (২) যে জনগণ নিজস্ব পছন্দ অনুসারে সরকার গঠন করতে চায় তাদের সমর্থন করা হবে (৩) ভবিষ্যৎ শান্তি মানুষের অভাব ও ভীতি নিরসন করবে (৪) বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক ভৌমিক ও বিস্তারনীতি পরিহার করতে হবে। অতলাতান্তিক সনদের এই নীতিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ ইটালী ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পনেরোটি রাষ্ট্র সমর্থন করে।



চার্চিল

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা: লীগ অব নেশনস্‌-এর মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। এর নাম ইউনাইটেড নেশনস্‌ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকায় অবস্থিত। মাত্র কয়েকটি দেশ বাদে পৃথিবীর সমস্ত দেশই-এর সদস্য। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা, এবং কোনও বিরোধের সূত্রপাত বা আশঙ্কা দেখা দিলে আপসে মীমাংসা করা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর একটি উদ্দেশ্য প্রত্যেক দেশের মানুষের মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক সমস্যার

সমাধান করা ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার। মোট কথা, পৃথিবীর জনগণের কল্যাণে এই জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের সম্প্রসারণঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফল হ'ল সমাজতন্ত্রবাদের সম্প্রসারণ। যুদ্ধের সময় নাৎসীবাদকে প্রতিরোধ করে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। এরপর লালফৌজের জয় এবং আধিপত্যের সুযোগে তারা অনেক স্থলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্বজার্মানিতে সমাজ-তান্ত্রিক সরকার শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উত্তর কোরিয়া ও চীনেও সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটে। এসমস্ত দেশ আজও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গণ্য। এদের মধ্যে রাশিয়া ও চীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সুফল আমরা দেখতে পাই। এই মহাযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ দারুণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের অধিনস্থ দেশগুলিকে দখলে রাখবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। যুদ্ধের শেষে দেখা যায় পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল পরাধীন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৬%শতাংশে নেমে আসে। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। একে একে ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতালাভ করে ভারতও একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। আশ্চর্য সাফল্য ও জাগরণ দেখা দেয় আফ্রিকা মহাদেশে। নিগ্রো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্বাধীনতা-স্পৃহা জেগে উঠে। ঘানা, গিনি-কামেরুন, নাইজেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে নতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সুদান, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মরোক্কো, আলজেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

॥ অনুশীলনী ॥

● মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১. চিয়াং-কাইশেক কোন্ দলের নেতা ?
২. কত খ্রীস্টাব্দে চীনে কমিউনিষ্ট দলের আবির্ভাব ঘটে ?
৩. ব্রহ্মদেশ কবে স্বাধীনতা লাভ করে ?
৪. কার নেতৃত্বে ইন্দোচীনে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন শুরু হয় ?
৫. ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
৬. ইউনাইটেড নেশান্সের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত।

● সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধরনের প্রশ্ন ঃ

১. সান-ইয়াৎ-সেনের তিনটি মৌলিক নীতি কি ?
২. চিয়াং-কাইশেক ও মাও-সেতুং-এর মধ্যে ঐক্যমত গড়ে উঠার কারণ কি ?
৩. ইন্দোনেশিয়া কোন্ কোন্ দ্বীপ নিয়ে গঠিত ? কিভাবে ইন্দোনেশিয়া ও ওলন্দাজদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয় ?
৪. কি উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয় ?
৫. অতলান্তিক সনদ বলতে কি বোঝ ? এর মূল শর্তগুলি কি ?

● রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. কিভাবে চীনে কমিউনিস্ট দলের আবির্ভাব ঘটে ? কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য কি ছিল ?
২. ইন্দোচীনে এবং ইন্দোনেসিয়ার মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে কি জান লেখ।
৩. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ? এর ফলাফল কি ?

● নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ কর :
ক.—অনুমতিক্রমে —চীনের রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করেন।
খ. সান-ইয়াৎ-সেন — খ্রীস্টাব্দে ক্যানটনে — নির্বাচিত হন।
গ. সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে — ও — বিশেষ উল্লেখ যাগ্য।
২. সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও :
ক. চীনা প্রজাসাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় — ১৯৪১/ ১৯৪৫/ ১৯৪৯ খ্রীঃ।
খ. চিয়াং-কাইশেক ছিলেন — নরমপন্থী/ মধ্যপন্থী/চরমপন্থী।
গ. চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় — ১৯১৬/১৯২১/১৯২৬ খ্রীঃ।